ইচ্ছামতী

শরত সংখ্যা ২০১০

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃশরত সংখ্যা ২০১০...1

শরতের চিঠি...4

পুজোর উপহার...11

- ধাঁধা...11
- রঙ ভরানোর ছবি...13
- পায়ের তলায় সর্ষে...14

ছড়া-কবিতা...30

- দুর্গা এলেন বাবার বাড়ি...30
- বায়না...32
- পুজোর গন্ধ...33

গল্প-স্বল্প...34

- বনের ধারে নদীর পারে...34
- বড়দেবীর পুজো...36
- থট্‌শপ্‌...42
- ভীতুর ডিম...46
- পূজোর চিঠি...52

বিদেশী রূপকথা: দাঁড়কাক...60

পড়ে পাওয়া: নীলমণিয়া...65

পুরাণকথা: কুন্‌গুত্তের পুরান ঝুলি...66

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ১...69

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ১...72

দেশে-বিদেশে...79

- সূর্য দেবতার দেশে...79
- দুইদিনে নিউ ইয়র্ক...86

বায়োস্কোপের বারোকথা: কলকাতায় প্রথম যুগের সিনেমা...97

পরশমণি: সংখ্যা নিয়ে খেলা...100

জানা-অজানা...106

- কোথায় গেল ডোডো...106
- জংলি ঘোড়া...111

এক্কা-দোক্কা: কমনওয়েল্‌থ্‌ গেমস্‌...114

আঁকিবুকি...119

প্রথম পাতাঃশরত সংখ্যা ২০১০

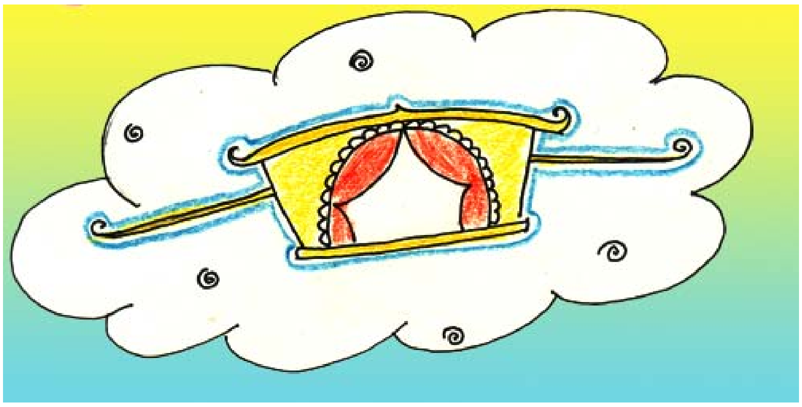

কৈলাশে তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। দুর্গা মায়ের বাপের বাড়ি আসার সময় হয়ে গেছে। আশ্বিন মাসের পিতৃপক্ষের শেষে দেবীপক্ষে মা নেমে আসবেন মর্ত্যে। এবারে মায়ের দোলায় আগমন। কথায় বলে, মা দুর্গা দোলায় এলে নাকি মড়ক লাগে। মড়ক লাগে কিনা জানিনা, তবে এই বছরে শুধু বঙ্গভূমিতেই নয়, সর্বত্রই নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। অনেক অনেকদিন পরে এবছর বাংলার আকাশে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ভাল করে মেঘ দেখা যায়নি। এবছর যে বৃষ্টি হচ্ছেনা, সে কথা তো আমরা ইচ্ছামতী বর্ষা সংখ্যাতেই বলেছিলাম, তাই না? শেষ অবধি, পশ্চিমবঙ্গে অনেক জেলায় খরা ঘোষণা করা হয়েছে। আর ওদিকে অন্য অনেক রাজ্যে নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে, বানে ভেসে যাচ্ছে ঘরদোর, মানুষ-পশু। কেন এমন হচ্ছে বলতো? সেকি শুধুমাত্র মা দুর্গা দোলায় চেপে বাপের বাড়ি আসছেন বলে? আমাদের কি কোনই দোষ নেই? আমরা ঘর বাড়ি বানানোর জন্য বন-জঙ্গল কেটে ফেলব, ক্ষেত-খামার নষ্ট করব, নদীর জলে এত ময়লা ফেলব যে নদীর জলধারন করার ক্ষমতা কমে যাবে...আর সব দোষ মা দুর্গাকে দিয়ে দেব, তা কি করে হয়?

কি ভাবছ? চাঁদের বুড়ি এত গম্ভীর কথা বলছে কেন? পুজো এসে গেছে,অথচ নতুন জামা- জুতোর গল্প না করে কিনা খরা আর বন্যার কথা? কি করি বল, চারিদিকের হাল হকিকত দেখে চাঁদের বুড়ি আর ইচ্ছামতী, দুজনেরই মন খুব খারাপ। পুজোর আনন্দের কথা ভাবতে গিয়ে ইচ্ছামতী জিজ্ঞেস করে তার বন্ধু লতাবুনী গ্রামের লকা, পাখিরালা গ্রামের আনন্দী, আন্দু বস্তীর সুরেশ, ক্যানিং এর রফিকুল, কাঁঠালগুড়ির মালতী, হাতিপোতার রিঙ্কু, নয়াগ্রামের অমর আর অমৃতা, বালির সিরাজুল - এরাও কি পুজোয় তার মত বা তোমার মত করেই আনন্দ করবে? বাবা-মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখবে মন্ডপে মন্ডপে, আলোয় সাজানো পথ ধরে ঘুরে বেড়াবে সন্ধ্যাবেলায় নতুন জামা পরে, ইচ্ছা হলেই খাবে চকোলেট বা চিপ্‌স্‌?

আমি কিন্তু ইচ্ছামতীকে সত্যি কথাটাই বললাম। না, ওরা সবাই নতুন জামা পাবে না। ওদের কারোর গ্রামের পাশের নদীতে বান এসে ভাসিয়ে নিয়েছে ঘর, কারোর বাবা খরার কারণে করতে পারেননি চাষ, পুরো পরিবার নিয়ে চলে এসেছেন শহরে, চলে গেছেন অন্য রাজ্যে, কাজের সন্ধানে। তাই হয়ত এবারে ইদে সিরাজুল আর রফিকুল পায়নি নতুন জামা, পুজোয় আনন্দী আর রিঙ্কু ঘুরবে খালি পায়ে। আমার কাছে এইসব শুনে ইচ্ছামতীর মন ভারি খারাপ হল। তখন আমি অনেক ভেবে আঁকলাম এক অন্যরকম ছবি - সেই ছবিতে দুর্গা মা নিজেই ইচ্ছামতীর সব বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। লকা,মালতী, সুরেশ,অমৃতা, রফিকুলের সাথে পথ হাঁটছে লক্ষ্মী, সরস্বতী,গনেশ, কার্তিক ও। শুধু তাই নয়, সেখানে আছে ইচ্ছামতীর সব নতুন-পুরানো বন্ধু, এমনকি, তুমি নিজেও আছ!!

সেই ছবি দেখে মুখে হাসি ফুটল ইচ্ছামতীর। বলল, আমিও যাব ওদের সঙ্গে আনন্দ করতে। আমি বললাম, যাবে যে, একটু সেজে-গুজে নেবে না? নতুন গল্প, নতুন ছড়া, নতুন তথ্য সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে, তোমার বন্ধুরা তোমাকে বলবে কি?

এই কথা শুনে ইচ্ছামতী নতুন ভাবে সেজে ওঠার জন্য তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। আর তোমার জন্য সেজে উঠল নতুন শরত সংখ্যা নিয়ে।

নানাধরনের পাঁচটা গল্প, নতুন ছড়া, বিদেশী রূপকথা, দেশে বিদেশে, এসব তো আছে, এছাড়া শুরু হচ্ছে তিনটি নতুন ধারাবাহিক - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে 'স্বাধীনতার কাহিনী', দেশবিদেশের পুরানকথা নিয়ে 'পুরাণঝুলি', এবং 'শিল্পের ইউরোপ', যেখানে আমরা জানতে পারব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংগ্রহে রাখা দুর্লভ সব শিল্পকর্মের কথা। এছাড়া পুজোর উপহার থাকছে শব্দছক, ধাঁধা, ছবির অ্যাল্‌বম, বন্ধুদের আঁকা ছবি। অবশ্য করেই পড় বেড়ানো নিয়ে এক মন্‌কাড়া মজাদার লেখা- 'পায়ের তলায় সর্ষে'।

ইচ্ছামতী এই পুজোয় দুই বছরে পা দিল। আরেকটু বড় হল। তাই ইচ্ছামতী এবার আরেকটু অন্য রকম ভাবে সেজে উঠল। এখন থেকে ইচ্ছামতীর প্রথম পাতা বা হোম্‌পেইজ্‌ সেজে উঠল অন্যভাবে- হয়ে গেল ইচ্ছামতীর 'খেলাঘর' যেখানে থাকবে নানা ধরনের খবরাখবর, লিঙ্কস্‌, অন্যান্য তথ্য এবং গেম্‌স্‌। কেন বলতো? যাতে নতুন আনন্দের সন্ধানে ইচ্ছামতীর কাছে তুমি মাঝে মাঝেই, পারলে রোজই একবার করে আস, যাতে ইচ্ছামতীর সাথে তোমার রোজ দেখা হয়...কেমন, বেশ ভাল হল না?

পুজোর কটা দিন তোমার সাথে সাথে থাকবে ইচ্ছামতী। আর তুমি থাকবে কার সাথে? - তুমি বলবে, আমি তো বাবা-মায়ের সাথে থাকব; কিন্তু আমি বলব, তুমি থাক রিঙ্কু, আনন্দী, সিরাজুল, অমর, লকা...সবার সংগে; ভাগ করে নাও আনন্দ আর খুশী। মা দুর্গাকে প্রার্থনা জানাও, যেন সবার মুখে সারা বছর থাকে হাসি, পেটে থাকে খাবার, পরণে কাপড়, হাতে কাজ। তবেই না সবাই মিলে দুর্গার বাপের বাড়ি আসার আনন্দে শামিল হতে পারবে।

মা এবারে ফিরে যাবেন হাতির পিঠে চেপে। যেতে যেতে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন সবাইকে। তাঁর আশীর্বাদে ভরে উঠবে ধরনীমায়ের আঁচল। পৃথিবী হবে শস্যপূর্ণা। আমরা তো চাই আমদের এই ইচ্ছা পূর্ন হোক। কিন্তু মায়ের এই বর সত্যিভাবে পেতে গেলে, আমাদেরও করতে হবে অনেক কাজ - বন্ধ করতে হবে অপচয়, বাড়াতে হবে গাছপালা, পরিষ্কার রাখতে হবে আমাদের আশ-পাশ -ভালোবাসতে হবে প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে। ইচ্ছামতীর হাত ধরে তুমিও ভালবাসবে তো সবাইকে? আমাকে চিঠি লিখে জানিও কিন্তু।

এই উতসবের মরসুমে, আনন্দ কর প্রাণ ভরে।

চাঁদের বুড়ি

২০শে আশ্বিন ১৪১৭
৭ই অক্টোবর, ২০১০
বৃহস্পতিবার
মহালয়া

শরতের চিঠি

আকাশের মুখ বেশ গোমড়া দেখে আনন্দ হল। কয়েকদিন বৃষ্টি নেই, চারিদিক খটখটে শুকনো। একটু ঝিরিঝিরে বৃষ্টি হলে বেশ হয়। মনে মনে যখন ভাবছি ক্যামেরা নিয়ে বের হব ঠিক তখনই লকু হেমব্রম এসে খবর দিলো সিদ্ধেশ্বরী নদীর চরে অনেক কাশফুল ফুটে রয়েছে।

ভারী সুন্দর সে ফুল।

সেই ফুল দেখলেই তার নাকি করম উতসবের কথা মনে পড়ে যায়।

আর তোমার কী মনে পড়ে সাজিদুল?

পবিত্র রমজানে এবারেও কি শিমাই খেতে খেতে আমার কথা মনে পড়েছে?

কী করবো বলো? কী করে যাবো? আমি তখন বীরভূমে, অনেক দূরের এক গ্রামে, তোমার জন্য কাশফুল আর পদ্মের ছবি তুলছি।

বুঝেছি, বেশ রাগ করে আছো আমার ওপরে।

অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি তোমায়।

অনেকদিন খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরিনা আমরা।

অনেকদিন করিম চাচার কাছে দুষ্টু কুমীরের গল্প শোনা হয় না।

সত্যিই অনেকদিন আমি যাইনি সুন্দরবন, অনেকদিন পাখিরালার বাঁধের ওপর জিলিপি খেতে খেতে হাঁটা হয়না।

এবার শীতে যাবো সাজিদুল।

কথা দিলাম।

তিন সত্যি।

লকু হেমব্রম তোমার মতই ক্লাস সেভেনে পড়ে, দারুন ফুটবল খেলে, তুখোড় ধামসা বাজায় আর সুন্দর লাঠি নাচ করে। সে তোমার মতই দলের পান্ডা। আমাকে সারাদিন গ্রাম দেখায়, আর রাতে খাওয়ার পরে বাঁধের ওপর নিয়ে গিয়ে মাচায় বসায়। সামনে টিমটিম করে জ্বলে ছোট্ট একটা হ্যারিকেন। মাচা কি জানো সাজিদুল?

বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরী একটা উঁচু ঘর। সেখানে গ্রামের অনেকে বসে গল্প করে, আড্ডা মারে, পড়াশুনো করে আর রাতের বেলায় অনেকে আবার ঘুমোয়।

ঠিক এই রকম মাচা আমি দেখেছিলাম বিহারের এক দূরের গ্রামে, সেই মাচার একটা সুন্দর মিষ্টি নাম আছে, "গাঁও কি দরওয়াজা"। যেখানে অনেক দূরের অতিথিরা এসে বিশ্রাম নেবে, ঘুমোবে। ওই দেখো মাচার কথা বলতে ছটু যাদবের গ্রামের কথাই প্রথমে মনে পড়লো, আর চিলাপাতার জঙ্গলে হরি রাভার গ্রামেও যে ঠিক একই রকম ঘর দেখেছিলাম সেটা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। এই মাঁচা অবশ্য আরো অনেক উঁচু, ওরা সবাই বলে টঙ। হরি রাভা, আমলা টোটো, সুজন নাসরিন, এদের

প্রত্যেকের গ্রামে একটা করে টঙ আছে। সেখানে ওরা কিন্তু আড্ডা মারতে যায় না, সেখান থেকে ওরা হাতিদের ওপর নজর রাখে। হাতিরা জঙ্গল থেকে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেই টিন পেটায়, চিতকার করে, আর হাতির দল ভয় পেয়ে, ক্ষেতের ক্ষতি না করে চম্পট দেয়।

কি মুখ চেপে হাসছো বুঝি?

তোমার কি সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেলো?

বুঝেছি, আমি কিন্তু সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

রাতে যখন করিম চাচা এসে আমাকে ডাকলো, বললো কেউ আজ ঘুমোবে না, সবাই জেগে গ্রাম পাহাড়া দেবে মশাল নিয়ে, আশে-পাশে "তিনি" ঘোরা ফেরা করছেন, আমার তো তখন ভয়ে দাঁত-কপাটি লাগার মতো অবস্থা।

সে রাতে অবশ্য বাঘ আসেনি।

দূর থেকে গর্জন শুনেই মা বনবিবিকে মনে মনে বার সতেরো ডেকে ছিলাম আর ভয় কাটানোর জন্য তুমি আমাকে মধু আনতে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছিলে। বেশ মনে আছে এখোনো।

এখন সেই গল্প থাক বরং চলো লকুর সাথে গিয়ে একটু মেঠো ইঁদুরের মাংস খেয়ে আসি।
কী তোমার ঘেন্না করছে?

না, না, ব্যাপারটা সে রকম একদমই না। খুব ভাল খেতে।

আজ আমি লকুদের অতিথি, তাই এক বিরাট পিকনিকের আয়োজন হয়েছে। গোটা সতেরো ইঁদুর ধরা পড়েছে। পিকনিকের অসাধারণ বন্দোবস্ত দেখে আমি ফড়িং এর ছবি তুলতে গেলাম। লাল কাঁকড়া আমাকে দেখিয়েছিলে সাজিদুল, আমি তোমাকে লাল ফড়িং দিলাম। কি তোমার সামনে ফড়ফড় করে উড়ছে তো?

এদিকে সারাক্ষণ ফোন করছে আমার অনেক ছোটবেলার বন্ধু হাবু, বলছে আর কবে আসবি বীরভূম থেকে? এদিকে তো কুমোরটুলিতে ঠাকুর আনতে যেতে হবে।

লকুর মন খারাপ, আমি করম উতসবের আগেই বীরভূম থেকে চলে যাবো শুনে।

সে যে কি সুন্দর করম পাতা মাথায় দিয়ে নাচবে তার আর ছবি তুলতে পারবো না ভেবে আমার মনও খুব খারাপ। আর এই সব মন কেমন করা মুহূর্তগুলো আমার ক্যামেরায় নিয়ে একদিন ফিরলাম বীরভূম থেকে।

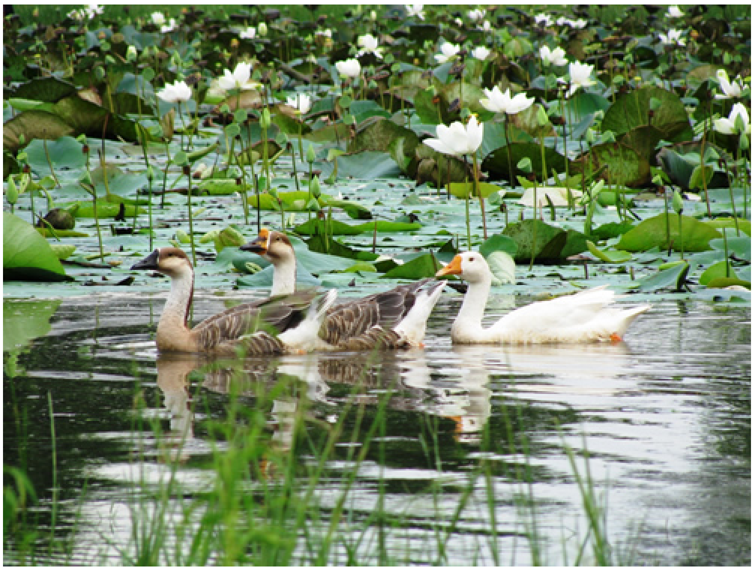

যতই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কুমোরটুলির সরু গলি দিয়ে এগোতে থাকলাম ততই ক্যানিং এর কানাইকাকা, মইদুল, রোশনের চেনা গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। "হেঁই সামালো পিছকে...হেঁইয়ো...হেঁইয়ো... জোর সামালো টানকে হেঁইয়ো হেঁইয়ো..." বড় বড় বাঁশের মধ্যে মোটা দড়ির ওপর ঝুলে মা দুর্গা সপরিবারে চলেছেন নৌকার দিকে।

বুড়ো শীতলকাকু থাকেন ডায়মন্ডহারবারে, চল্লিশ বছর ধরে এই পুতুল ওঠানো নামানোর কাজ করছেন (এখানে কেউ ঠাকুর বলে না, চলতি কথা পুতুল)

মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই বৃষ্টি প্যাচাল মারবে না, আপনারা ওঠেন, পুতুল ওঠান...।" হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, " দুগগে দুগগে..."।

মাঝ গঙ্গায় তখন আমরা, সত্যিই সাজিদুল এবার একটুও বৃষ্টি নেই, জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে আমাদের নৌকাগুলো। আর আমার বিদ্যাধরীর কথা মনে পড়ছে...হরিণভাঙার কথা মনে পড়ছে...আর মন বলছে এবার শীতে আমাদের দেখা হবেই।

খুব ভালো থেকো আর মস্ত বড় একটা চিঠি লিখো।

কল্লোল।

পুজোর উপহার

ধাঁধা

বলো তো দেখি কী:

১. গোল মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা, মাথায় কিরণ জ্বলে,
বাইরে থেকে দেবদর্শন, নীচেয় পুকুর চলে।

২. জ্ঞানের যেথায় অন্ত হয়, সেথায় যেতে হলে,
বিলয় হতে নেইকো দেরী,দ্বিতীয় অক্ষর গেলে।

৩. কাজ আছে প্রথম দুইয়ে,শেষের দুইয়ে জীবন,
যদি ও হয় অঙ্গশোভা, তিনে কালো বরণ।

৪. জলশূন্য মাঝখানে, যদি ও আমি ফল.
আগেপিছে জালের আভাস,নামটি ভেবে বল।

৫। সময় আমি আদি অন্তে,আদি পাখির ডাক,
তিনে মিলে দুর্বল বড়, পথেই বসে থাক।

(উত্তর পরের পাতায়)

ডঃ জি সি ভট্টাচার্য
বারানসী, উত্তরপ্রদেশ

উত্তরমালাঃ---

১। হ্যারিকেন (লন্ঠন)

২। বিদ্যালয়

৩। কাজল

৪। জামরুল

৫। কাহিল

রঙ ভরানোর ছবি

এই পাতা থেকে মা দুর্গার এই ছবি ডাউনলোড কর, আর ভরিয়ে ফেল তোমার পছন্দমত রঙ দিয়ে।

পায়ের তলায় সর্ষে

পৃথিবীর ম্যাপটাকে যদি দূর থেকে ছোট করে দেখি, মনে হয় যেন কেউ সেটাকে হাতরুটির মত করে বেলে দিয়েছে। দেখেই বেড়াতে ইচ্ছা করছে। আমেরিকান কোম্পানির ম্যাপ বলেই বোধ হয়, এত ছোট করে ম্যাপটা ধরে থাকা সত্ত্বেও স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ফটোখানি ঠিক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মহাকাশ থেকে দেখা যায় কেবলমাত্র চীনের প্রাচীর। এখানে অবিশ্যি গোল পৃথিবীকে বেলে চ্যাপ্টা করে ফেলায় সুমেরু আর কুমেরু হাস্যকর রকমের বড় হয়ে গেছে। অবশ্য তুমি যদি অঙ্কে দড় হও, তাহলে বলবে ওরকমই হবার কথা – যা দেখছি ঠিকই দেখছি – এ জগতে সবই মায়া!!

কিন্তু যদি ম্যাপটাকে কাছে আনতে আনতে একেবারে কলকাতা থেকে শুরু করি, রুটিখানা দেখতে ততটাও খারাপ লাগবে না। ওপর থেকে বেশ ধূসর -হলদে, ম্যাটকা মতন রঙ হয়েছে গঙ্গা নদীর, আমি আপাততঃ বেলঘড়িয়া থেকে সোনারপুর দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। নদীর চারিদিকে এত সবুজ যে ভাবাই যাচ্ছেনা যে একদম নিচে নেমে এলে কি বিষম কেলো দেখতে পাওয়া যাবে!

আমার মূল ইচ্ছেটা হল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরার। ইতিহাস বইতে যে রাস্তাটার কথা লেখা ছিল, এটাই

সেটা। যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও তবে তোমাকে তুলে নেব আনোয়ার শাহ রোড থেকে। সাউথ সিটির সামনে। এই সাউথ সিটি হয়ে ইস্তক এই রাস্তায় এমন ঝামেলা বেধেছে, যে চলা ফেরাই দুষ্কর। অথচ দেখ, এই যে আমরা ঢাকুরিয়া লেক থেকে মোড় নেব, সেখানে থিকথিকে বাড়িঘরদোরের মধ্যে একটা কেমন সুন্দর জলে ভর্তি জায়গা। পেছনে স্টেডিয়াম, ক্রিকেট মাঠ কত কি...আর এইটাকে নাকি লোকে বুজিয়ে দেবে ভাবছিল! বেশি ভাবলে এই হয়!

যাই হোক, আসল কথা হল জি টি রোড আমরা মেট্রো লাইন ধরেই যেতে পারতাম। ময়দান অবধি মেট্রোয় গিয়ে তারপর গাড়ি। 'সেইল' কোম্পানির অফিসের সামনে থেকে বাঁদিকে যাব– স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া। ভাল করে দেখলে কিনা জানিনা, ডানদিকে পড়ল ইস্টবেঙ্গল আর এরিয়ানের মাঠ, তারপর বাঁদিকে মোহনবাগান। তারপর ডাইনে মহামেডানের মাঠ পেরিয়েই দেখ কেমন আউট্রাম ঘাটের দিকে একটা কান্নিক নিয়েছি।

হাওড়া ব্রীজ

ভর গরমে হাওড়া ব্রিজ পেরোতে গিয়ে সুড়সুড় করে বাতাস দিচ্ছে। আমরা ইচ্ছে করলে নৌকায় বসেও দক্ষিণেশ্বরের দিকটা একবার চট করে হয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু থাক, গুলমোহরের মাঠটা ডানদিকে রেখে জিটি রোড ধরে ফেলি। এখান থেকে আড়াআড়ি গেলে বেনারস রোড। এই বয়সে কাশী যেতে চাইলে যাও, আর না হলে সোজা দেখ। এই রাস্তার ওপর সাপুড়েরা আগে হাল হামেশা খেলা দেখাত। এখন তো সে সব আইন করে বন্ধ হয়ে গেছে। বললে বিশ্বাস করবে না, লিলুয়া এখান থেকে মাত্র আট কিলোমিটার, আর আমরা কিনা দূরপাল্লার ট্রেন হলেই হাওড়া ঢোকার মুখে লিলুয়া পেড়িয়ে হালুয়া তে আটকে থাকি। এপথে অবিশ্যি বেলুড় মঠ ও পড়বে, সেখানে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিলে আশ্চর্য আরাম হবে।

বেলুড় মঠ

এখানে ডানদিকে নদীতে গুটগুট করে নৌকা যাচ্ছে, আর তীরে যত লোহালক্কড়, খোলা-বন্ধ পাটের কারখানা। এরপর দেখবে কেমন ঝিমুনি আসছে- ছোট ছোট টাউন, মাঝেমাঝে গাছপালা। ধুলো উড়ছে, বিকেল হয়ে আসছে, দোকানের সাইনবোর্ডের ঠিকানায় লেখা - রিষড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর। এসব বললেই এক্ষুণি কেউ আমাকে ক্যাঁক্ করে চেপে ধরে বলবে - এগুলি ছোট টাউন!! অ্যাঁ? সে যাই হোক গে - দুই নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে প্রায়ই আরো জোরে এপথেই লোকে যায়, কিন্তু তারা কি আর বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর, ব্যান্ডেল - এইসব দেখতে পায়? দিনের শেষে তো সেই একটা পান্ডবর্জিত জায়গা থেকে অবশ্য জাতীয় সড়ক ধরতেই হবে, যার সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন হল আদিসপ্তগ্রাম! একবার হাইওয়েতে পড়লে আর রোখে কে! যত সব শহুরে জটিল পথের ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে আমরা হুহু করে বেড়িয়ে যাব। পশ্চিমবঙ্গ শেষ হল বলে। জায়গাটাকে যতটা পান্ডব বর্জিত লাগছিল, ততটাও না। তোমার পাচ্ছিল ঘুম, হুট করে ডেকে নিয়ে এলাম বলে সঙ্গে একটা গল্পের বই অবধি নেই, ঘুম পেতে বাধ্য! আমরা আছি পান্ডুয়ার কাছে, এখানে চৌদ্দশো শতাব্দীর একটা মিনার আছে, প্রায় বারো তলা উঁচু।

কার্জন গেট, বর্ধমান

তবে সেখানে না গিয়ে দুধারে ধানক্ষেত দেখতে দেখতে আমরা বর্ধমান পৌঁছে যাব, আর বর্ধমান পৌঁছানো মানেই হল দুর্গাপুর পৌঁছে যাওয়া। শান্তিনিকেতনও যে খুব দূরে, তা নয়। এখানে দুইদিন থাকলে রমনাবাগান ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারিতে লেঙ্গুর আর চিত্রপৃষ্ঠ হরিণ দেখে আসা যেত। আর যেতে পারতাম মাইথন ড্যাম, তোপচাঁচি ঝিল, পরেশনাথ পাহাড় আর তিলাইয়া ড্যাম। পরিবেশবিদরা ঠিক ভুল যাই বলুন, এই মানুষের তৈরি ড্যাম আর ব্যারেজগুলি দেখতে যে কি সুন্দর, বলে বোঝানো দুষ্কর।

তিলাইয়া পেরোলেই বিহার। চারদিকে লাল ধুলো, রুক্ষ, আর তার মধ্যে দিয়ে শোণ নদী বয়ে গেছে। শোণ নদীর ওপর ডেহরিতে একটা বিখ্যাত ব্রিজ গেছে– ইংরেজ আমল থেকে তার নাম হয়েছে 'ডেহরি অন শোণ', ঠিক যেন শেক্সপিয়রের শহর 'স্ট্র্যাটফোর্ড আপন অ্যাভন' বা কিংবা 'নিউকাস্‌ল অন টাইন ' এর মত। শোণ নদী পেরোলে পৌঁছাব সাসারাম বলে একটা শহরে। এখানে নামতেই হবে। সবুজ পান্নার মত জলে দাঁড়িয়ে আছে শের শাহ সুরীর কবর। জলের মাঝে বললাম ঠিকই, কিন্তু আদতে এটা একটা চৌকো পুকুরের ঠিক মাঝখান অবধি তৈরি করা একটা রাস্তা।

শের শাহ সুরীর কবর

এপথে বিহার এটুকুই - কারণ, একটু চালালেই উত্তর প্রদেশ চলে আসে। কিন্তু এত অল্পে তো চোখ ভরে না। তাই তদ্দুর যাওয়ার আগে, ভাবুয়া জেলায় যাব তেলহর কুন্ড। এ জায়গায় আগে ছিল মগধ রাজ্য। ইদানীং বিজ্ঞানীরা এই কুন্ডের আশেপাশে খোঁড়াখুঁড়ি আর খোঁজাখুঁজি করে পাথরে খোদাই করা প্রাচীণ সব ছবি বের করেছেন - আর সে সব ছবির সাথে স্পেনের আলতামিরা গুহার ছবির আশ্চর্য মিল!

উত্তর প্রদেশে অবশ্য এখন এ পথে ক্ষেত আর বিশাল বিশাল কারখানা। এত সুন্দর করে ক্ষেতিবাড়ি হয়েছে যে আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন নকশী কাঁথায় নকশা তোলা হয়েছে। মাঝে মাঝে ছোটখাট জনবসতি - ছোট মানে প্রায় শ' দুই পাকা বাড়ি– তত ছোটও নয়। ট্রেনে করে এলে চণ্ডাউলি নামে একটা স্টেশনে এখানে হল্ট দেয়, তারপর মোগলসরাই হয়ে কাশী চলে যায়। কাশীতে এত ক্যাঁচোর ম্যাচোড় আর গন্ডগোল, যে লোকে হালহামেশা ছবি তুলতে ছোটে - তারপর সে সব ছবি

বড় বড় আসরে প্রাইজ পায়! কিন্তু আমি কস্মিনকালে গিয়ে উঠেতে পারলাম না, ফেলুদার সিনেমা বাদ দিলে ; আজকেও, কাশীটা বাদ দেওয়াই ভাল। কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে তো আসিইনি এখনও। আর গিয়েও বা কি হবে - বেনারস এখন হদ্দ নোংরা হয়েছে,পশু আর মানুষের গুয়ে ভরতি। ফটো থেকে ত আর গন্ধ বেরোয় না রে বাবা!

কাশী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রাস্তায় গঙ্গানদী একদম কপিবুক ছকে ভূগোল বইতে দেখানো অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের ছবিটার মতো অ্যাঁকাব্যাঁকা। আর এইযে এলাহাবাদ, তার মধ্যে দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখা গেছে, তার সময়ই আমাদের ভারতের সময়। কলকাতার আসল সময়টা সত্যি করে দেখলে, ঢাকার সময়।

অল সেইন্টস্ ক্যাথেড্রাল, এলাহাবাদ

এত কথা ভাবতে ভাবতে আমরা টুক করে রাজস্থানে ঢুকেছি। এবারে শুরু হবে বালি, হাভেলি আর মন্দির -মসজিদের সমারোহ। ফতেপুরের পর যতক্ষণে জাহানাবাদ, এটাওয়া জংশন, এইসব পেরোবো, গঙ্গার চেয়ে যমুনা নদী অনেক কাছে চলে আসবে। তখন নাক বরাবর গেলেই আগ্রা! আর আগ্রা মানেই হচ্ছে ঘন লস্যি, তাজমহল আর নোংরা গিটগিটে যমুনা নদীর মশা।

তাজমহল, আগ্রা

তা বলে দমলে চলবে না, এরকম মোগলাই জায়গায় কি রোজ আসি? আরো বড় কথা হল, মোগলাই রাজত্ব থাকলেই রাজপুতরা আসেপাশে ঠিক ঘুরঘুর করবে। তাই জন্যেই তো এখান থেকে রাস্তা গেছে সোজা জয়পুর। ওই তো, নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, বাজার বসেছে, তরমুজ বিক্কিরি হচ্ছে, তার মধ্যে আবার গরু ছাগলের মত একপাল উট হেঁটে হেঁটে আসছে; এই ধুলোবালির মধ্যে বড় শহর কেবল উদয়পুর, বাকি খাঁ খাঁ; প্লেন ল্যান্ড করার সময়ে বোঝা যায় কেমন বড়।

উদয়পুর

মুশকিল হচ্ছে ঐ 'খাঁ খাঁ' নিয়ে। রাস্তা না জানলে মহা গেরো। তবে ভুল হবার যো নেই। একটা মাত্র মেন রোড একগাদা টিপিঢাপার মধ্যে দিয়ে সোজা গেছে আজমেড় শরীফ। আজমেড়েই হল বাবা চিস্তির দরগা, সেখানে চাদর চড়াবো আর কাওয়ালি শুনব। এখানে মসজিদের উঠোনে যা কাওয়ালি গাওয়া হয়, সে শত খরচা করলেও স্টেজে শোনা যায়না। পাকিস্তানে সাঁই জহুর বলে এক দুর্ধর্ষ কাওয়াল আছেন, তিনি বছর তিনেক আগে গানের জন্য একটা বিরাট প্রাইজ পেলেন বিলেতে -ওয়ারর্ল্ড মিউসিক অ্যাওয়ার্ডস্-এ। অথচ তখন ওনার একটিও সিডি, ক্যাসেট, রেকর্ডিং কিচ্ছু ছিল না, কেবল দরগায় দরগায় গাইতেন। সে গান এমন গান, যে লোকমুখে চারিদিকে নাম ছড়িয়ে গেল। বড় বড় চাঁইরা সাঁইকে পরখ করতে এসে চক্ষুস্থির হয়ে গেলেন। ওনার "আল্লা হু" শুনলে বুঝবে গানের মত গান কি করে গাইতে হয়। তবে যা বলছিলাম- আজমেড়ের দর্গায় খুব সাবধান! পকেটমার থিকথিক করছে! এই যে পীর বাবা একটা সাদা চামর দুলিয়ে আমাদের হাওয়া দিচ্ছেন, তিনি পর্যন্ত বিড়বিড় করছেন - 'পকেট সামহালকে, পকেট সামহালকে...!"

আজমের শরীফ

আজমের এর পাশেই হল পুষ্কর। তার মধ্যে নাকি দুর্যোধন ভীমের ভয়ে লুকিয়ে ছিল। যত্ত সব বাজে কথা! আগে এখানে পচা পাতামাতা অসহ্য নোংরা করে রাখত, এখন পরিষ্কার করে বাঁধিয়ে দেওয়াতে ভাল লাগছে। পুষ্করে অনেক কম পরিচিত দেব-দেবীর মন্দির আছে - ব্রহ্মা, সাবিত্রী এসব...মরুভূমির মধ্যেকার জায়গা বলে বোধ হয় বেশি পাল্টায়নি। কিন্তু তা বলি কি করে? এত পুজো-আচ্চার মধ্যেই তো টিনের চালে দেখি 'পিঙ্ক ফ্লয়েড কাফে' - ভেতরে চা আর ভেজিটেবল্‌ কাট্‌লেট - ফ্রি ওয়াই-ফাই অবধি পেয়ে যেতে পারি।

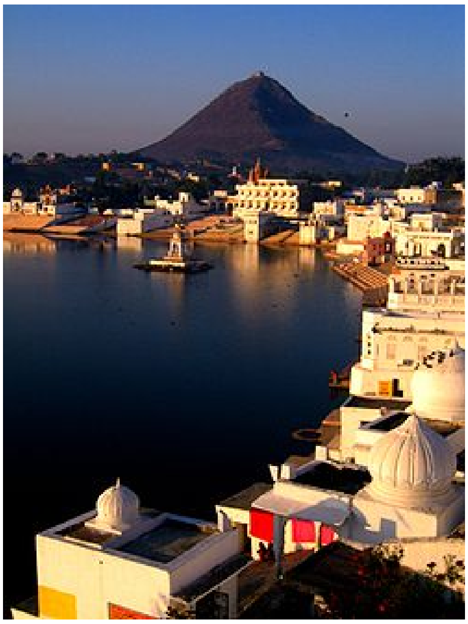

পুষ্কর

তবে পুষ্করের ওপারে শুধুই মরুভূমি। এখান দিয়ে গেলে চাক্ষুষ বোঝা যায় আকাশে ধীরে ধীরে পাখি কমে যাচ্ছে, এক কোণায় হয়ত বা একটা ছোট্ট মাজার হলদে পাথরের গা ঘেঁষে পড়ে আছে। একেই বলে থর মরুভূমি। একটা লোক নেই, এককেটা বাড়ির মধ্যে বহু মাইল দুরত্ব, চলতে চলতে চোখে ধোঁয়া লাগে, ততক্ষণ, যতক্ষণ না একটা স্টেশন আসে। এলা রঙ করা স্টেশন, ঝকমক করছে, কোনও যাত্রী নেই, একপাশে লোহার বেড়া। এইখানেই ভারতবর্ষের শেষ। ওপাড়ে উমেরকোট দুর্গ।

তা বলে পাকিস্তানে ঢুকে পড়লেই বোঝা যাবে না যে অন্য দেশে এসেছি। যাবে কি করে? সব তো আগে এক ছিল। একই চেহারার লোক, এক রকম রাস্তা, সব এক; এই তো, শহরের নাম অবধি হচ্ছে হায়দ্রাবাদ! তবে এ হায়দ্রাবাদ, আমাদের অন্ধ্রের নামপল্লী, মানে সে হায়দ্রাবাদের থেকে অনেক আলাদা। তবে দুজনেই কিন্তু সমুদ্রের খুব কাছে। এখান দিয়ে সিন্ধু নদ বয়ে গেছে। এখানে প্রচন্ড গরম - এপ্রিল মাসে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি গরম... বৃটিশ আমলের পুরনো ছবি আছে এই হায়দ্রাবাদের, আপাদ মস্তক ধুলোয় মোড়া দোতলা বাড়ি, মাথায় একটা তেরচা তেকোণা ব্যাপার খাড়া করা- সেই কায়দা করে লাগানো বিরাট তেকোণা ঘুলঘুলি বয়ে শীতল বাতাস ঢুকছে। কেল্লাটা এখনও আছে, কিন্তু বড় দুর্দশাগ্রস্ত। এই ঊষর, ধূসর রাস্তার নাম হল করাচী- হায়দ্রাবাদ হাইওয়ে। বোঝাই যাচ্ছে, রাস্তা কোথায় নিয়ে চলেছে। করাচী হল সমুদ্রের ধারে মেগাসিটি। সেখান থেকে আরব সাগরের পাড় ঘেঁষে গাড়ি চালালে সিধা বেলুচিস্তান।

করাচী

কিন্তু মুকুলের দুষ্টু লোকের মত আমরা বেলুচিস্তান যাব না। পাসনি বলে একটা নৌকাঘাটা আছে, তার ডানদিকে তুরবাত বলে একটা জায়গায় যাব। কারণ, কিছুই না, সমুদ্র বরাবর রাস্তাটা আসলে এয়ারপোর্টের পরেই শেষ হয়ে যাবে। তুরবাত পৌঁছোলে একের পর এক ড্যাম - এখানেই পাকিস্তান শেষ হয়ে ইরান শুরু হল। এখানে বাহুকালাত বলে একটা লম্বা নদী আছে, তাতে মাঝে মাঝেই কুমীর

দেখতে পাওয়া যায়। ভাব একবার - মরুভূমিতে কুমীর ঘোরাফেরা করছে। আবার এই পথেই পাহাড়ের মধ্যে একটা এইটুকু ছোট্ট শহর আছে তার নাম কি না হল 'জবর-দস্ত'! এইটা কিন্তু বেলুচিস্তানেরই অংশ। ইরানশেহর থেকে বাঁদিলে গেলে দেখবে মাঝে মাঝেই একের পর এক সরাইখানা। নানান নাম না জানা শহর, প্রাচীন পারস্যের খোদাই করা মূর্তি। যেগুলির নাম মনে রাখা কঠিন, সেগুলি মনে রাখা কষ্ট। কিন্তু পথে যে কতগুলো হায়দ্রাবাদ, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, জাহানাবাদ, হোসেনাবাদ, হাজিবাদ, হাসনাবাদ পড়ছে তার সীমাসংখ্যা নেই!

আর এভাবে চলতে চলতেই দেখছি বালির রঙ হলদে থেকে একেবারে ফটফটে সাদা হয়ে গেল। নস্‌রাবাদের ছুঁচলো চুড়ো দূরে উঁকি দিচ্ছে। এটা খুবই অদ্ভূত, কারণ ইরানে বেশিরভাগ মসজিদের মাথা হয় গোল। এখানকার পাথরের পাহাড়গুলোতে সকাল সন্ধ্যায় এমন সব আশ্চর্য রঙ ধরে যে ছবি তুলে কলকাতায় দেখালেই একেবারে ডবোল ফার্স্ট প্রাইজ দেবে! একটা তো দেবে পাহাড়ের রঙের জন্য, অন্যটা দেবে মরুভূমিতে উট আর উটপাখির ছবি তোলার জন্য;এক্কেবারে বাঁটুল দি গ্রেট এর উটোর মত দেখতে।

উট ও উটপাখি

এই পথেই মসজিদে ভরা 'কোম' বলে একটা শহর পড়ে, তার ঠিক আগের শহরের নাম 'আয়না', আর ইস্ফাহানের দিকে গেলেই নমক লেক।সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! টন টন নুন শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে নিজে থেকেই লেকের পাশে পড়ে আছে। লবণ আন্দোলনের মত দলবল নিয়ে নুন তুলতে শুরু করলেই হয় আর কি!

নমক লেক

এ অঞ্চলে অল রোড্‌স লীড টু তেহরান - সে আমরা যে পথেই গমন করি না কেন...পুরো মরুভূমি ঝেঁটিয়ে পার করে যে কোথা থেকে এতগুলি রাস্তা এসে তেহরানে ঢুকেছে খোদায় মালুম! আজাদী স্কোয়ারের মধ্যে দুপেয়ে আজাদী টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে - কিন্তু এত ভীড় যে আমাদের এগোতে হবে। মাঝখান থেকে মনটা খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এ পথেই ইস্ফাহান পড়ার কথা ছিল, কিন্তু পেলাম না। কে জানে কেন? ইস্ফাহানের ফুলের কারুকার্য করা শেখ লুতফুল্লা মসজিদ, রাতে আলো জ্বলা চেহেল সতুন প্রাসাদ, ফ্লোরেন্স এর মত খাজু ব্রিজ, ফুলের বাগান, সব বৃথা গেল।

আজাদী টাওয়ার

তেহরানের উত্তরদিকে গেলে আর মরুভূমি নেই, বরফে ঢাকা সাদা ধপধপে পর্বত। রাস্তার দুধারে রঙিন উঁচু গাছের সারি। আর পাহাড়টা পেরোলেই কাস্পিয়ান সাগর। এখানে বাইশ নম্বর রাস্তাটা পুরোটা কাস্পিয়ানের ধার দিয়ে গেছে। এখানে কোথায়ই বা থামব, আর কোথায়ই বা চালাব? একপাশে সমুদ্র, অন্যদিকে পাহাড় - যেমন সূর্যোদয়, তেমন মায়াময় সূর্যাস্ত। আর তেমন খানাপিনা! মাঝে মাঝে এমন কি কমলালেবুর বাগান পর্যন্ত রয়েছে।

ক্যাভিয়ার ও কমলালেবু

এই বাগান গুলির কাছে 'অঞ্জলি' বলে একটা জেলা আছে,সেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্যাভিয়ার পাওয়া যায়। মাছের এমন ডিম শত খুঁজলেও কোথ্থাও পাবো না। সাগর আর পাহাড়ের মধ্যে শুধু ঘন সবুজ জঙ্গল। কে বলবে একটু আগেও সবকিছু ধুলো আর বালিতে ঢাকা ছিল? এই রাস্তাতেই শেষের দিকে 'হয়রান' বলে একটা শহর, তারপর পাড়ের কাছে 'আস্তারা' বলে একটা শহর, আর তার পরেই তুর্কী। না, ভুল বললাম- আজারবাইজান।

কাস্পিয়ান সাগরের তীরে সব থেক বড় নগর বাকু, আজারবাইজান

আজারবাইজান ভারি মজার জায়গা। তুর্কি যেমন এশিয়া আর ইউরোপের সন্ধিস্থল, তেমন, আজারবাইজান হল এশিয়া থেকে রাশিয়া আর পূর্ব ইউরোপ যাওয়ার রাস্তা। আর সেইজন্য এখানে লোকজনের নাম খুব মজাদার - যেমন- 'আরিফ রাজ্জাকভ' বা 'জামিল গুলিয়েব' বা 'নাফিসা আব্দুল্লায়েভ' কিংবা 'ফরিদ মনসুরভ'। আর এদের খাওয়া-দাওয়া অতি উৎকৃষ্ট। দেখেছ - দোকানে কি বিকোচ্ছে? আমরা যাতে না বুঝতে পারি তাই নামটা কেবল অল্প করে বদলে দিয়েছে। গনগনে গরম কৌরমা প্লেট, সবজি দিয়ে জোবজা কৌরমা প্লেট, তারপরে দোল্মা, শরবত- এইসব। এরা কিন্তু খাওয়া দাওয়া নিয়ে খুব সিরিয়াস। আমরাও।

আজারবাইজানের খাবার

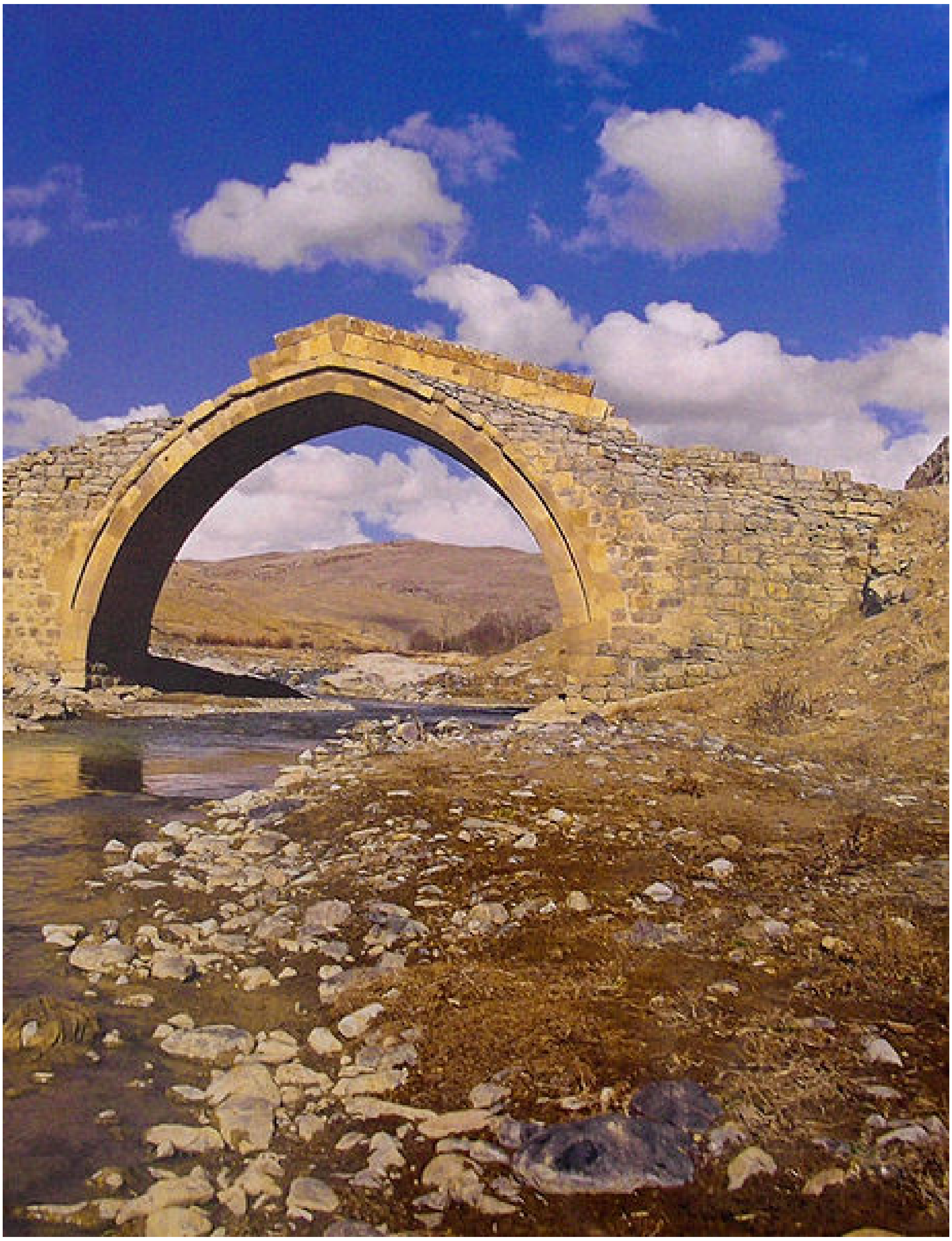

ইরান ও আজারবাইজানের এক সীমান্ত

আসলে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে ক্রমশঃ দেশ বদলে যাচ্ছে। খালি সীমান্ত আর সীমান্ত – একটু এদিক ওদিক করলেই ইরান থেকে আর্মেনিয়া হয়ে জর্জিয়া,তুর্কি এইসব জায়গায় পৌঁছে যাব। তবে রাস্তা একটাই। আজারবাইজানের 'গাঞ্জা' শহর দিয়ে আর্মেনিয়ার 'লেক সেভান' –এ। এই লেক এর ওপরে একটা অসাধারণ সুন্দর চার্চ আছে। সেভান লেকের অবস্থা এক সময়ে আরল সাগরের মতই হয়ে যাচ্ছিল।

লেক সেভান, পাড়ে চার্চ

আরল সাগরের গল্পটা জান তো? এই বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও আরল সাগর ছিল পৃথিবীর পাঁচটা বৃহত্তম হ্রদ গুলির মধ্যে একটা। তারপর ওখানে একটা ড্যাম বানাতে গিয়ে কুড়ি বছরে সব খতম। যা পড়ে আছে, তাতে এত রাসায়নিক বিষ যে মাছ চাষ অবধি বন্ধ হয়ে গেছে। আবহাওয়াও আর আগের মত নেই। লেক সেভানে ঠিক এভাবে জল কমিয়ে চাষবাসের কাজে লাগাতে গিয়ে সবকিছুর বারোটা বেজে যাচ্ছিল। কিন্তু সময় মত মানুষের টনক নড়ায় সেটা আটকানো গেছে।

সেভান লেক থেকে দক্ষিণে নেমে এলেই হল আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান। আর তার নীচে বয়ে চলেছে আরাস নদী। সেই নদী পেরোলে আবার তুর্কী। এই আরাসের কাছে আরারাত পাহাড় দেখতে খুব ভাল লাগে। এই আরারাতেই নাকি নোয়ার নৌকা ফেঁসে গেছিল। কয়েকশো বছর আগে আরারাত ছিল আগ্নেয়গিরি। আর এখন মাথাভর্তি বরফে তার মাথা ঠান্ডা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ১৮৪০ সালে একখানা ভূমিকম্প হয়েছিল বটে, তখন নাকি ভেতরে ভেতরে লাভা বেরিয়েছিল।

আরারাত পাহাড়

এই এলাকায় তুর্কীর সেই বিখ্যাত শহর 'কার্স' - যার ওপর কিনা নোবেলজয়ী লেখক ওরহান পামুক ' স্নো' বলে এক অসাধারন বই লিখেছেন। এখান থেকে শত শত রাস্তা জট পাকিয়ে এ শহর থেকে ও শহরে চলে গেছে। শহরের আয়তন অকিঞ্চিৎকর হলে কি হবে - তুর্কীর শহর, এমনকি এরজুরুমের মত মেজ শহরেও না থেকে পারব না।

এরজুরুমের মিনার

এ অঞ্চল আদিতে ছিল আনাতোলিয়া - রোমান আর গ্রীক সাম্রাজ্যের স্মৃতি এখনও রাস্তায় রাস্তায়। বাইজান্টাইনরা এই জায়গার নাম দেয় থিওডোসিপোলিস। দূর থেকে দেখবে এসব শহরের মাথায় এখনও মসজিদের চূড়ো বর্শার ফলার মত দাঁড়িয়ে আছে। তুর্কীর পূব থেকে পশ্চিমে গেলে প্রথমে বরফ থেকে সমতল, তারপর নানা হ্রদ, জঙ্গল, মিনার। আর এসবের মধ্যে গোলকধাঁধার মত নকশা আঁকা রাস্তা। মাকড়শার জালের মত এই পথ ধরে উপরে এলে দেখি কি আশ্চর্য - আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে একেবারে কাস্পিয়ান সাগর! আহা না, এটা নির্ঘাত কৃষ্ণ সাগর! তবে এর অবস্থা আরলের মত না। জান তো, প্রাচীনকালে এই সমুদ্রের মত হ্রদ ধরে ইরান হয়ে বহু মানুষ ভারতবর্ষে পা দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ সাগর

আর হ্রদ থাকলেই পাশ দিয়ে ঠিক রাস্তা করা রয়েছে – গভীর জল, পাহাড়, সূর্যাস্ত – আর কি চাই! এখানে এত জনপদ, কিন্তু জীবনে এদের নাম শুনিনি – কোকামান, পাশালর, কারাসু, উজুনকুম, কোপরু, চিকো, কাদিকোয় ...

কিন্তু দেখ, কাদিকোয় তো লোকে ইস্তাম্বুল থেকে এমনি এমনিই যায়; তবে কি আমরা ইস্তাম্বুলের আশেপাশে এসে পড়েছি কোথাও? বলতে বলতেই আন্দালু হিসরি এসে পড়েছে, সাগর কেমন পাতলা হয়ে একটা প্রণালী তৈরি করে ফেলল, একের পর এক নৌকা আন্দালু কাভাগির দিকে যাচ্ছে – এটা নিশ্চয় বসফরাস প্রণালী!

ইস্তানবুল

যা বুঝছি, আমরা প্রায় ইস্তাম্বুল এসেই গেছি। এবার আর গাড়ি না চালিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়লেই হয়। প্রণালীর পূর্ব দিকের সব কটা ঘাট বা বন্দর পড়ে এশিয়ার দিকে আর পশ্চিমে সবকটা পড়ে ইউরোপের মধ্যে। মাঝে দুটো বিশাল সেতু স্থলপথে ইউরোপ আর এশিয়াকে দুটো সুতোর মত আটকে রেখেছে। প্রণালীর উল্টোদিকে মর্মরা সাগর– অবশ্য মর্মরা মানেই তো সাগর। আমরা চলে আসছি এমিনোনুর জাহাজঘাটায়, সারাটা রাস্তা একের পর এক মিনার আমাদের পাশে – এখানে ছিল অটোমান সুলতানদের প্রাসাদ, আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গোড়া। অবশ্য তখন তো আর ইস্তাম্বুল নাম ছিল না, নাম ছিল কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল্‌। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে এসব গল্প করছি তার নাম হালিচ, বা গোল্ডেন হর্ন। হালিচ ছিল বাইজান্টাইন নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র। দেখতে পাচ্ছ কি, কিভাবে একটা তলোয়ারের মত এ জায়গাটা মর্মরায় ঢুকে গেছে? বিকেলের রোদে সেই তলোয়ার সোনার মতই ঝকঝক করছে। আর হ্যাঁ, এখানে এশিয়া শেষ হয়ে গেল, ওপারে ইউরোপ।

মর্মরা সাগর এবং গোল্ডেন হর্ন

বিক্রম
ডাব্‌লিন, আয়ারল্যান্ড

ছড়া-কবিতা

দুর্গা এলেন বাবার বাড়ি

ছোট্টো মেয়ে মিমি,
ভাবছে বসে বসে
পুজোয় ঠাকুর দেখতে যাব
অঙ্কখানা কষে
লক্ষ্মীদিদি রান্না ছেড়ে
এলেন মামার বাড়ি
সরস্বতীর বইয়ের সাথে
কয়েকটা দিন আড়ি
পেটটি মোটা গণেশ দাদা
পড়াশোনা ফেলে
দিনরাত্রি সবসময়
বেড়ান শুধু খেলে
কার্তিক দাদা কার্তিক দাদা
সঙ্গে ময়ূর নিয়ে
কলকাতার সল্টলেকে
করতে গেছেন বিয়ে
বাবা শিবের ভাত এখন
কেই বা দেবে বেড়ে
মা দুর্গা বাবার বাড়ি
এসেছেন ঘর ছেড়ে

থাকবেন মা কয়েকটি দিন
শিব কে গেছেন বলে
পুজো শেষে কৈলাসেতে
যাবেন তিনি চলে।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

বায়না

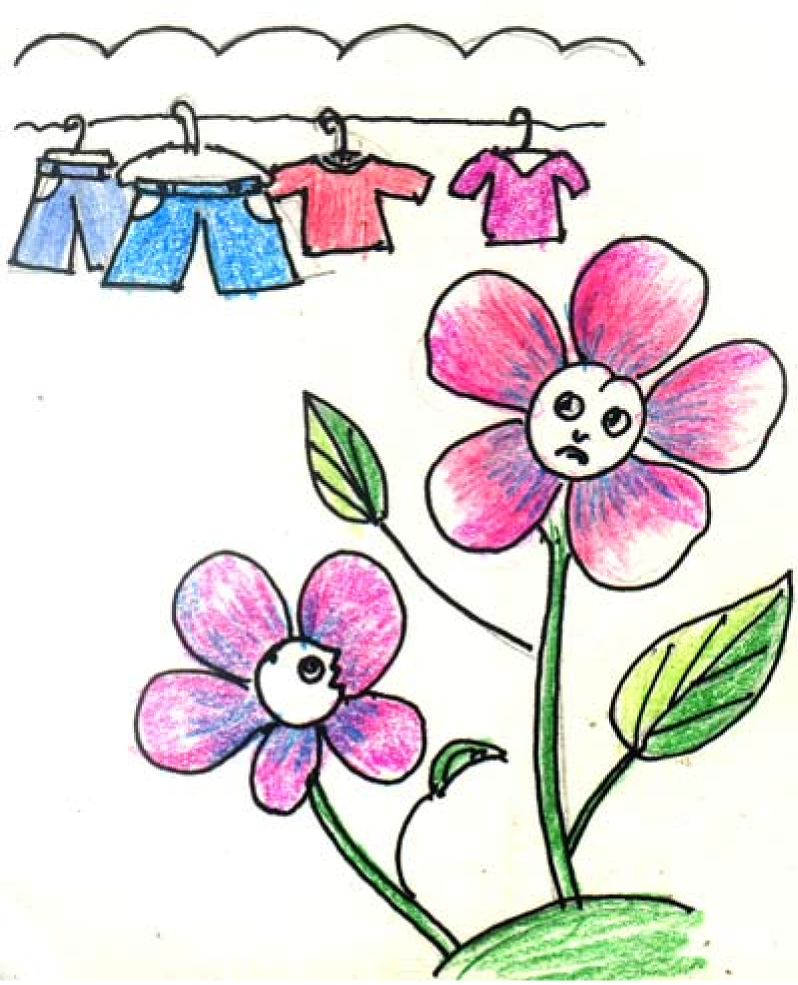

আজকাল যা দিন পড়েছে
বায়না করছে গাছেরাও।
নার্সারি থেকে বেরোতে যাব
চারা গাছটা জামা টেনে
বল্‌ল, "আমায়
ফুল প্যান্ট দাও"

পৃথ্বীরাজ চৌধুরি
বস্টন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পুজোর গন্ধ

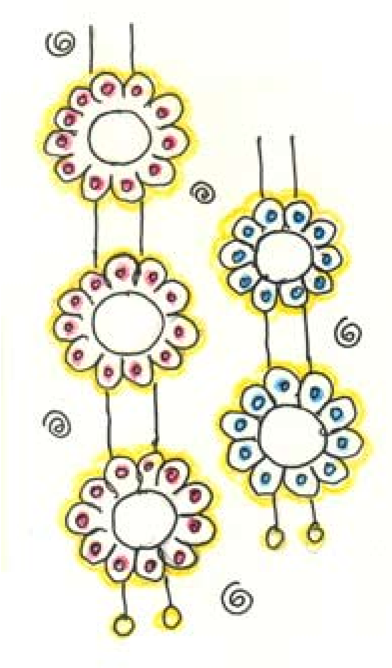

বারো মাসে বাঙালীর
অগণিত পর্ব
শরতেই আছে যেন
বাঙালীর গর্ব।
যোগমায়া একা নয়,
ছেলেমেয়ে সঙ্গে
সাড়া ফেলে চারিদিকে
আমাদেরই বঙ্গে।
বাংলার নরনারী
শারদীয় নন্দে
মাতোয়ারা কয়দিন
পুজো পুজো গন্ধে।

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

গল্প-স্বল্প

বনের ধারে নদীর পারে

বনের ধারে নদীর পারে রহিমদের বাড়ি। গাঁয়ের নাম মকুলি। সেখানে আবার কয়লার খাদ। সেই খাদে কাজ করে রহিমের বাবা।

মকুলিগাঁয়ের পাশের গ্রাম- নওয়াডি। সেখানে রামেদের বাড়ি। রামের বাবা রোজ আসে মকুলি। রহিমের বাবার সাথে একসঙ্গে কাজ করে।

রহিমের বাবা প্রতি রোববার আসে রহিমদের বাড়ি। সঙ্গে আসে ছোটো ছেলে রহিম।

ঠিক পরের রোববার রামের বাবা আসে রহিমদের বাড়ি। সঙ্গে আসে ছোটো ছেলে রাম।

রামের সাথে রহিমের খুব ভাব। মকুলিতে এলে রহিম রামকে নিয়ে অটোরিক্সায় চেপে বলে, চল্ নদীর পাড়ে যাই।

নদীর পাড়ে সারি সারি গাছ। আর নদীর জলে কত রকমের মাছ। রাম নদীর পাড়ের গাছ দেখতে ভালোবাসে। আর রহিম ভালোবাসে নদীর জলের মাছ দেখতে।

নওয়াড়িতে এলে রাম রহিমকে নিয়ে গোরুর গাড়িতে চাপে। বলে, চল্ মাসির বাড়ি।

সেখানে একসাথে দুজনে মাঠে খেলা করে। রামের মাসি বাটি ভরে ওদের মুড়ি খেতে দেয়। সঙ্গে থাকে পেঁয়াজ ও খেতের কাঁচালঙ্কা। রাম ওর বাবার মত পেঁয়াজ খেতে ভালোবাসে। আর রহিম ওর আব্বাজানের মতো কাঁচালঙ্কা কচ্ কচ্ করে খায়।সন্ধে হলেই ওরা বাড়ি ফিরে আসে।

রাম বাড়িতে এসে যে বই পড়ে, রহিমও সেই বই পড়তে বসে যায়। রাম বাড়িতে এসে যে অঙ্ক কষে রহিমও সেই অঙ্ক কষতে বসে যায়। আসলে দুজনেই এক ক্লাসে পড়ে আর একই ইশকুলে। ইশকুলের নাম শিশু বিদ্যামন্দির। মকুলি আর নওয়াড়ি ছাড়িয়ে সেই ইশকুল। ইশ্কুলে ওরা বাসে চেপে যায়। সবাই বলে, কোলিয়ারির বাস। বাসে উঠেই জানালার পাশের সীটে বসে ওরা হাওয়া খেতে খেতে যায়। রহিম খুশি হয় রামকে পেয়ে। রামও খুশি হয় রহিমকে পেয়ে। গান গাইতে গাইতে হাততালি দিতে দিতে ওরা ইশ্কুলে পৌঁছোয়।

এমনি করেই দিন চলে। রামের বাবা কালিঝুলি মেখে বাড়িতে ঢোকে। রহিমের আব্বাজানও ঝোড়া-বেলচা কাঁধে বাড়িতে আসে।

রহিম দেশ বলতে জানে এই ছোট্ট গ্রাম মকুলিকে। আর রাম জানে ওদের গ্রাম নওয়াড়ি-কে। এত বড় একটা দেশে কত কিছু ঘটে যায়। কত দিন যায়, কত রাত যায়।

রাম রহিমকে ঈদের দিনে এসে বলে যায়- ঈদ মোবারক। রহিম রামকে বুকে টেনে নেয়। রহিমের মা রামকে খেতে দেয় কত রকমের সেউ-এর পায়েস।

আর দুগ্‌গোপুজোর দিনগুলিতে রহিম রামেদের বাড়ি ছাড়তেই চায় না। নতুন জামা পরে রামের সাথে সে-ও ঠাকুর দেখতে যায়। ট্রেকারে চেপে ঘুরে বেড়ায় ডুমরি, সুরী ও গিরিডি। রামের মা রহিমকে ডেকে আদর করে সেদিন খেতে দেয় বাসমতী চালের পায়েস। আর দেয় চার-চারখানা লাড্ডু। যা পেলে রহিম আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

রাম আর এই রহিম যেন
ছোট্ট দুটি ভাই,
বনের ধারে, বলো এমন
বন্ধু কোথা পাই?

সুনির্মল চক্রবর্তী

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী তাঁর এই গল্পটি ইচ্ছামতীতে প্রকাশিত হবার অনুমতি দিয়েছেন। এই গল্পটি পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বড়দেবীর পুজো

বাগডোগ্‌রা এয়ারপোর্টে পিনাকীরঞ্জনের বিমান যখন ল্যান্ড করল, তখন তাঁর ঘড়িতে সকাল দশটা। ধবধবে সাদা পাজামা আর ফিকে বেগুনী রঙের ফিনফিনে একটা খাদির পাঞ্জাবি পরেছেন পিনাকী। বহুদিন পর কোচবিহারে ফিরছেন, মনটা স্বভাবতই একটু হালকা পলকা তাঁর।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালেন পিনাকী। ঝকমক করছে রোদ। শ্রাবণ মাসের আকাশ যে এত নীল হতে পারে সেটা ভাবাই যায় না। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রকৃতির ঋতুচক্রটাকেই পালটে দিচ্ছে রাতারাতি। সেই ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল পিনাকীর। শ্রাবণের বর্ষা একবার শুরু হলে আর থাম্বার নামই করত না। পুরনো দিনের কথা ভেবেমনটা একটু বুঝি ভার হল তাঁর।

তিনি যে কোচবিহারে যাবেন তা গতকাল দুপুর পর্যন্ত পিনাকী নিজেই জানতেন না। ডালাস থেকে দেশে

এসেছিলেন কোম্পানির কিছু কাজ নিয়ে। বেঙ্গালুরু আর মুম্বইতে তাঁর কোম্পানির ব্যবসা সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ছিল গত সপ্তাহে। সেসব সেরে কলকাতায় এসেছিলেন পরশু দুপুরে। এতকিছুর পর আজ কলকাতাতেও একটা জরুরি বোর্ড মিটিং ছিল তাঁর। সেটা বানচাল হয়ে গেল একজন বোর্ড মেম্বার আচমকা মারা যাওয়ায়। গতকাল বিকেলে খবরটা শুনেছিলেন তিনি। ওদিকে আমেরিকা ফিরে যাবার টিকিট কাটা আরও তিন দিন পর। এই তিন্টে দিনের ছুটি চট করে যখন হাতে এসেই পড়ল, তখনই কোচবিহারে আসাটা ঠিক করে ফেলেছিলেন পিনাকী।

যেহেতু হঠাত করে আসাম বিমানবন্দরের বাইরে কেই পিনাকীর জন্য অপেক্ষা করে নেই। একটা হুটার দেওয়া অ্যাম্বাসাডার ছিল এক মন্ত্রীর জন্য। পথচারীদের চমকে দিয়ে সেটা বেরিয়ে গেল প্রথমে। লালবাতি লাগানো সরকারি গাড়ি ছিল কিছু, সেগুলোও বেপাত্তা হয়ে গেল নিজের নিজের দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে। যাঁদের নিজস্ব গাড়ি ছিল, তাঁরাও এক এক করে নিজেদের গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেলেন।এখন বাইরে লাইনে ভাড়ার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। দু-একজন যাত্রী দরদাম করছেন সেইসব ড্রাইভারদের সঙ্গে। পিনাকীর তেমন তাড়াহুড়ো নেই। লক্ষ করলে তাঁর পেছনের সিটে সফর করা সাদা রঙের শার্ট পড়া চাপদাড়ি ভদ্রলোক কোচবিহার যাবার ভাড়া নিয়ে দড় কষাকষি করছেন। ট্যাক্সিচালক চাইছে দু'হাজার টাকা। সেই ভদ্রলোক দেড়া হাজারের বেশি দিতে রাজি নন।

পিনাকী নিজেও কোচবিহার যাবেন। তিনি দু-পা এগিয়ে গেলেন। সাদা শার্ট পরা ভদ্রলোককে প্রস্তাব দিয়েছেন শেয়ারে যাবার জন্য। এবার পিনাকী ভাল করে তাকালেন মানুষটার দিকে। পঁয়তাল্লিশ্ এর আশপাশ দিয়ে হবে বয়স। টকটকে ফর্সা রঙ, চোখে একটা বাইফোকাল চশমা। দাড়িতে আর পাট করে আঁচরানো চুলে পাক ধরেছে সামান্য। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা ভদ্রলোকের।

পিনাকীর কথায় ভদ্রলোক বিলক্ষণ রাজি। দু'হাজারের জায়গায় এক হাজারেই ব্যবস্থা হয়ে গেলে আর মন্দ কি!দু'জনেরই লাগেজ বলতে একটা করে ছোট ট্রলিব্যাগ। ড্রাইভার ডিকির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তাঁদের দুজনের ব্যাগ। এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। হিন্দি ফিল্মের গান লাগিয়ে দিয়েছে সাউন্ড সিস্টেমে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে মন্থর গতিতে। পিনাকী পাশের ভদ্রলোকের দিকে আড়চোখে তাকালেন একবার। একসঙ্গে ঘন্টা চারেকের পথ যেতে হবে, চুপচাপ তো আর যাওয়া যায় না! হাল্কা গলায় জিজ্ঞেস করলেন- কি করেন আপনি, চাক্রি না ব্যবসা?

চাপদাড়ি ভদ্রলোক পিনাকীর কথায় উত্তর না দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে- কি হিন্দী গান চালাচ্ছ রে ভাই তখন থেকে! কানের তো পোকা নড়িয়ে দিলে তুমি! তোমার স্টকে রবীন্দ্রনাথের গান নেই?

ড্রাইভারের মুখ কাঁচুমাচু, রবীন্দ্রসঙ্গীত তো নেই স্যার। একটা সিডিই ছিল, স্ক্র্যাচ পড়ে খারাপ হয়ে গেছে।

পিনাকীর নিজেরও অসহ্য লাগছিল এই চিতকার করে গাওয়া গানগুলো. এবার পিনাকী ধমক দিলেন ড্রাইভারকে, নেই যখন তখন বন্ধ কর তোমার এই অসহ্য হিন্দি গান। এরপর থেকে দু'চারটে রবীন্দ্রনাথের গানের সিডি কিনে রাখবে। সেগুলো রাখবে গাড়িতে।

ঘাড় নেড়ে ড্রাইভার রিমোট দিয়ে তড়িঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছে গান। মারকাটারি জগঝম্প বন্ধ হওয়াতে

বেশ শান্তির পরিবেশ ফিরেছে। এবার অনেকটা আরাম বোধ করলেন দুজন। চাপদাড়ি পিনাকীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমি আসলে সাংবাদিকতার চাকরি করি।কোচবিহারে আমার বাড়ি। বছরে এক-আধবার করে বাড়ি এসে ঘুরে যাই কিছুদিন। এটা তেমনই আসা। ভদ্রলোক হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম প্রনব দেববক্সী।

তেষ্টা পেয়েছিল জোর,একটা খনিজ জলের বোতল কিনেছিলেন দোকান থেকে। সেটাই পিনাকী গলায় ঢেলে নিলেন একটু। তারপর বোতলটা পাশে সরিয়ে রেখে প্রতিনমস্কার করলেন। তিনি যে ডালাসে আপাতত বসবাস করছেন, এটা তাঁর পুরো পেশাগত কারণে দেশে আসা, এবং সে কারণেই যে তাঁর স্ত্রী পুত্রদের ছেড়ে আসতে হয়েছে সে সব জানিয়ে দিলেন পিনাকী। তারপর বুকপকেট হাত্‌রে একমুঠো ক্যান্ডি ধরিয়ে দিলেন প্রনবের হাতে। সিগারেট ছাড়ার পর গাদাগুচ্ছের ক্যান্ডি পকেটে রাখাটাই তাঁর অভ্যেস। প্রণব মানুষটিকে বেশ লাগছে তাঁর। দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার ফলে স্বজাতীয়দের প্রতি একটা দুর্বলতা তৈরি হয়ে গেছে, বাঙালি দেখলেই তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন। বাংলায় কথা বলার সুযোগ পেলে আর কিছু চাই না তাঁর। প্রণব একে বাঙালি, তায় মনে হচ্ছে বেশ মিশুকে মানুষ, পিনাকী তাই মহাখুশি।

তার মানে কোচবিহারে আপনি তিনদিনের ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন, প্রণব নরম গলায় বললেন। পিনাকী এবার আরো একটু ঝেড়ে কাশলেন, আসলে এবার শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী তিথি পড়েছে আগামীকাল। কোচবিহার রাজবাড়িতে আবার ওইদিন ময়নাকাঠ পুজো করে বড়দেবীর পুজোর কাজ শুরু হয়ে যায়। বহু বছর আমি দেশছাড়া। মাঝে এসেছি এক-আধবার, কিন্তু এই বিশেষ সময়টায় আসা হয়নি কখনও। সেই ছোটবেলায় হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় যে বড়দেবীর পুজো দেখেছি, সেটা এখনও মনের ভেতর গেঁথে আছে। কাকতালীয়ভাবে সেই স্মৃতিটাকে টাটকা করবার একটা সুযোগ পেয়েই গেলাম যখন, তখন ভাবলাম, লেটস্ গ্র্যাব দ্য অপরচুনিটি। বড়দেবীর পুজোটা আর একবার দেখে আসি গিয়ে।

প্রণব বললেন, বাহ্, খুব ভালো করেছেন। আমার নিজেরও ওই পুজোটা দেখবার একটা বিশেষ কৌতূহল আছে। আমি নিজে এভতি অল্টারনেট ইয়ার এ সময়টাতে বাড়িতে চলে আসি। বড়দেবীর পুজোটা কভার করি আমার পত্রিকার জন্য। তাতে বাড়ি ঘুরে আসবার একটা সুযোগ জুটে যায়, আবার সেই যাতায়াতের খরচ-টরচ সব আমার কাগজ থেকেই পেয়ে যাই।

পিনাকী হেসে মাথা নাড়লেন, তার মানে রথ দেখা আর কলাবেচা- দুটো উদ্দেশ্যই আপনার সাধন হয় এখানে এলে?

প্রণব হো হো হাসছেন, যা বলেছেন।

পিনাকী বললেন, আমার বেশ মনে আছে, গুঞ্জাবাড়ির কাছে ডাংরাই মন্দিরে বড়দেবীর পুজোটা হত। তা দেখতে কোচবিহারের বাইরে থেকেই লোক আসত।

প্রণব বললেন, ঠিকই বলেছেন, এখনও তাইই হয়, কাল শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী তিথি, কাল সন্ধেবেলা রাজ প্রতিনিধি হিসাবে একজন দুয়ারবক্সি ময়না কাঠ আবাহন করবেন। মন্দির থেকে ঢাক আর সানাই বাজিয়ে পালকিতে চাপিয়ে সেই কাঠকে মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে আসবেন সেই দুয়ারবক্সি। মদনমোহন

মন্দির চত্বরের একটি ঘরে টানা এক মাস ধরে ঐ কাঠের পুজো হবে।

পিনাকী মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, হাইলি ইন্টারেস্টিং। তারপর?

প্রণব বললেন, এরপর ভাদ্রের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে মহাস্নান আর ধর্মপাঠ পুজোর পর সেই কাঠ দেবীবাড়িতে বড়দেবীর মন্দিরে প্রতিস্থাপন করা হবে। তার তিন দিন পর থেকে সেই কাঠে খড় দিয়ে ভোঁতা বেঁধে শুরু হবে বড়দেবীর মূর্তি গড়ার কাজ।

সত্যিই, রাজা নেই, রাজ্যপাট নেই, পিনাকী ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু কয়েকশো বছর ধরে এই পুজোটা হয়ে আসছে পুরো নিয়ম নিষ্ঠা আর অনুশাসন মেনে, ভাবলে অবাক লাগে, তাই না!

কথা বলতে বলতে গাড়ি তিস্তা ব্রিজের ওপর দিয়ে চলছে। প্রণব হটাত করে ড্রাইভারকে বললেন, ভাই, আমি জানলার কাচটা খুলব। তোমার এ-সিটা একটু বন্ধ করে দাও।

ড্রাইভার এ-সি অফ করবার আগেই জানলার কাচ নামিয়ে প্রণব মুখ বের করে দিয়েছেন বাইরে। শ্বাস নিয়েছেন বুক ভরে। পিনাকী বড় বড় চোখ করে কান্ড দেখছিলেন প্রণবের। বললেন, কি ছেলেমানুষি করছেন? অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে তো!

প্রণব তেরছা চোখে তাকালেন পিনাকীর দিকে, রাখুন আপনার অ্যাক্সিডেন্ট! কত যুগ পর তিস্তা নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, আর তিস্তার গায়ের গন্ধ একবার প্রাণ ভরে নেব না মশাই! জানেন তো, তিস্তা তোর্ষা জলঢাকা সঙ্কোশ রায়ডাক - প্রত্যেকটা নদীর ঘ্রাণ কিন্তু আলাদা। এটা যে জানে, শুধু সে-ই জানে।

ঠিক ঠিক, এটা তো আমার খেয়াল করা উচিত ছিল, এবার পিনাকী নিজেও তাঁর পাশের জানলার কাঁচটা ত্বরিতগতিতে নামিয়ে ফেলেছেন। তারপর মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন বাইরের দিকে। এক কিলোমিটার লম্বা ব্রিজটা শেষ হবার পর আবার দুজন মাথা ঢুকিয়েছেন গাড়ির ভেতর। দুজনেই হাসছেন শিশুদের মত। ড্রাইভার বড় বড় চোখ কঅরে বয়স্ক দুটি খোকার কান্ড দেখছিল লুকিং গ্লাস দিয়ে। পিনাকীবললেন, এসি-টেসি আর চালাবার দরকার নেই ভাই। গরম লাগে লাগুক। বাকি রাস্তা প্রাণ ভরে আমাদের ডুয়ার্সের ঘ্রাণ নিতে নিতে যাব।

পিনাকী ক্যান্ডির মোড়ক খুলে একটা ক্যান্ডি মুখের ভেতর পরেছেন। জিভ দিয়ে নাড়ছেন আলতো আলতো। তারপর প্রণবের উদ্দেশে চোখ বুঁজেই বললেন, ময়নাকাঠকে দেবী হিসেবে কল্পনা করে কবে থেকে পুজো শুরু হয়, জানা আছে কি আপনার?

প্রণব বললেন, সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা ষোড়শো শতাব্দীর শুরুতে বড়দেবীর পুজো শুরু করেছিলেন কোচ রাজবংশের স্থপতি মহারাজা বিশ্বসিংহ। কিন্তু মূর্তি গড়ে পুজোর চল শুরু হয় ষোড়শো শতকের মাঝামাঝি, মহারাজা নরনারায়ণের আমলে।

ঠিক, পিনাকী সায় দিলেন। মুন্সি জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান নামে একটা বই আমি পড়েছি। সেখান থেকে জেনেছি যে মহারাজা নরনারায়ণের ভাই তথা সেনাপতি শুক্লধ্বজ একদিন কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে রাজসভায় ঢুকেছিলেন।

শুক্লধ্বজ? মানে চিলা রায় নামে যিনি খ্যাত, তিনিই তো?

ঘাড় নেড়েছেন পিনাকী, সপারিষদ নরনারায়ণ তখন সিংহাসনে বলে ছিলেন। তবে খোলা তলোয়ার হাতে ভাইকে রাজসভায় ঢুকতে দেখে মহারাজ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ভাইয়ের দিকে। নির্নিমেষ সেই দৃষ্টির সামনে পড়ে চিলা রায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন ঐ সভাস্থলেই।

হুম, শুনেছি গল্পটা, প্রণব বললেন, পরে জ্ঞান ফিরলে চিলা রায় স্বীকার করেছিলেন যে তিনি মহারাজকে হত্যা করবার জন্যই রাজসভায় এসেছিলেন। কিন্তু রজসভায় ঢুকতেই তিনি নাকি দেখেন যে স্বয়ং দেবী ভগবতীর কোলে বসে রয়েছেন রাজা নরনারায়ণ। এই ঘটনার পর মহারাজা তিনদিন তিনরাত ধ্যানস্থ থেকে দেবী মহামায়ার দর্শন পান। তারপরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে রাজ্যে পুজো হবে এবং দেবীর নাম হবে দশভুজা।

পিনাকী বললেন, দেবীর দেবীর ডান পা সিংহের পিঠে আর বাঁ পা মোষের পিঠে ঠাকবে। অসুরের ডান হাত সিংহের মুখে আর বাঁ হাত বাঘের মুখে ঢোকানো থাকবে। বাঘের সামনে থাকবে জয়া-বিজয়ার মূর্তি। তবে দেবীর দু'পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকবে না।

প্রণব হাসলেন, একদম ঠিক। ওই ময়না কাঠের ওপ্রেই প্রাচীন রীতি মেনে গড়া হবে দেবীমূর্তি। আগে রাজ আমলে জঙ্গল থেকে ময়না কাঠ সংগ্রহ করা হত। এখন গ্রামগঞ্জে ওই কাঠ পাওয়াই যায় না। তাই কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডেড় পক্ষ থেকে আনন্দময়ী ধর্মশালা চত্বরে ওই গাছ লাগান হয়েছে শুনেছি।

সেখান থেকেই কাঠ নিয়ে কাল সকাল দশটায় ডাংরাই মন্দিতে পুজো হবে। পিনাকীর মুখ একটু উজ্বল হল, প্রতিবছরের মত সেই পুজো করবেন রাজ পুরোহিত শ্রী পৃথ্বীরঞ্জন ভট্টাচার্য।

আপনি কিভাবে জানলেন? আপনি কি তাঁকে চেনেন? প্রণব বিস্মিত হয়ে বললেন।

পিনাকী হাসছেন, চিনি অল্প অল্প। সম্পর্কে তিনি আমার বাবা।

আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই!প্রণব পিনাকীর ঘাড়ে চাপড় মেরেছেন উত্তেজনায়, এতক্ষণ ধরে পাশাপাশি সফর করছি, এই কথাটা আপনি এতক্ষণে বললেন? কোচবিহারে আপনার বাবাকে চেনে না এমন লোক একটিও নেই!

পিনাকী মৃদু মৃদু হাসছেন। প্রণব এবার চকচকে চোখে পিনাকীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এবার তবে আমার অন্য পরিচয়টাও দিয়ে দিই আপনাকে।

পিনাকী ভুরু জড়ো করেছেন। প্রণবের দু'ঠোঁট কান ছুঁইয়ে ফেলল প্রায়, ময়নাকাঠ যিনি আবাহন করবেন, তাঁর নাম প্রবীর দেববক্সী। তিনি আমার আপন জ্যাঠামশাই। কেন এই পুজোর জন্য আমার এতটা টান, সেটা এবার বুঝেছেন নিশ্চয়। কাজেই বুঝতাই পারছেন, বড়দেবীর পুজোর সঙ্গে আমার কানেক্শনটাও নেহাত্ ফেলনা নয়!

সারা আকাশ জুড়ে ভাসছে সাদা সাদা মেঘ। মেঘের আড়ালে মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছেন সূর্যদেব। আবার বেড়িয়ে আসছেন প্রখর তপনতাপ সঙ্গে করে। জানলা পুরো খোলা, পিনাকীদের গাড়ি ফালাকাটা ছাড়িয়ে

শিলতোর্ষা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এক কিলোমিটারের চাইতে কিছু কম দৈর্ঘ ব্রিজটির। আবারও জানলা দিয়ে মুখ বের করে দুজন বুখ ভরে শ্বাস নিলেন। দুজন বয়স্ক মানুষের ভেতর কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, এবার সহসা জেগে উঠেছে দুটি শিশু। আলাদা আলাদা কারণ, তবু বড়দেবীর পুজোর আয়োজন দুজনকেই টানছে অমোঘ আকর্ষণে। পিনাকী-প্রণব দুজনের বুকের ভেতরাই মাদল বাজছে দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ করে। কোচবিহারের দিকে যত এগোচ্ছেন, ততই উতলা হয়ে পড়ছেন দুজন। দুজনেই তুমুল অধৈর্য এই সামান্য পথ বুঝি ফুরোয় না আর!

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
জলপাইগুড়ি

থট্‌শপ্‌

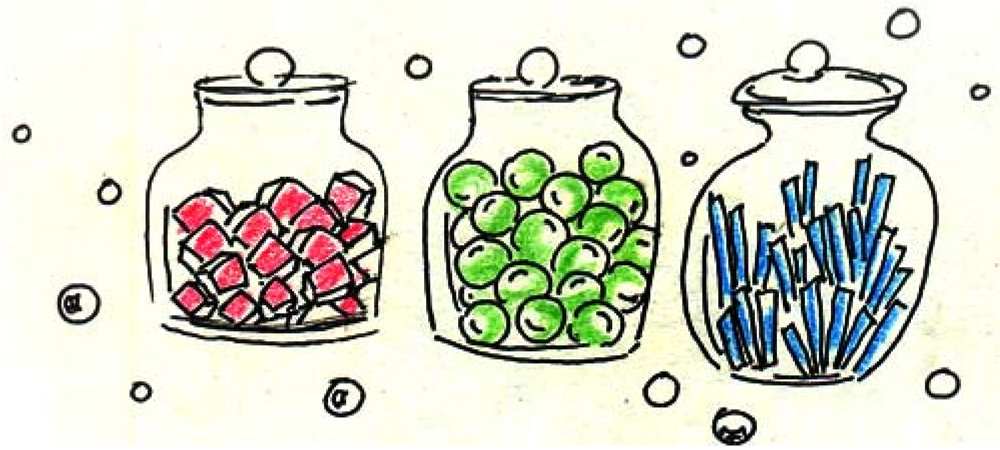

সে এক ছিল মজার দোকান। দোকানের নাম "থট-শপ"।সেই দোকান সাধারণ মানুষ খুঁজে পেত না, যার যাবার ইচ্ছে হত সে ঠিক পৌঁছে যেত সেই দোকানে। মালিক এক থুড়থুড়ে, দাড়ি ওলা বুড়ো যার নাম চিন্তামণি, অনেক বয়স তাঁর। এক সময় ছিলেন রসায়নবিদ। ক্রিস্টালের ওপরে রিসার্চ করেছিলেন বহু বছর। সে দোকানে কত রকমের সব জিনিষ বিক্রি হত। থরে থরে সব সাজানো থাকতো কাঁচের বয়ামের মধ্যে। ঠিক যেন লজেন্স! লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা.... কত রঙের বাহার।

কত ধরণের গড়ন সেই সব রঙীন লজেন্স-ক্রিস্টালের; কোনোটা ছুঁচের মত, কোনোটা রম্বসের মত, কোনোটা আবার চোঙাকৃতির, কোনটে বা আয়তঘনাকার।প্রত্যেক বয়ামের গায়ে স্ফটিকের নাম, দাম

আর গুণাবলী লেখা থাকত। বুড়ো চিন্তামণি দোকানের মধ্যে টেষ্টটিউব, বানসেন বার্নার, বিকার, ফিল্টারপেপার, ফানেল আর আইসবক্স নিয়ে বসে থাকত ঘন্টার পর ঘন্টা নাওয়া-খাওয়া ভুলে। ছোট ছোট বাক্সের মধ্যে রাখা রঙবেরঙয়ের নুন-চিনির মত দানা বের করে তাদের জলে দ্রবীভূত করে, ফুটিয়ে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে বরফে কিম্বা ঠান্ডা জলের মধ্যে রেখে রাতে বাড়ি চলে যেত; পরদিন এসে দেখত কেমন সব রঙ বেরঙয়ের স্ফটিকের উত্পত্তি।বুড়োর ছিল এক গ্লাসরড যা প্রত্যেক ক্রিস্টালে ছোঁয়ালেই একটা করে চিন্তা বা "থট" ঢুকে যেত তার মধ্যে। আর যে সেই ক্রিস্টাল বুড়োর কাছ থেকে কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়ে বয়ামে লেখা নিয়ম মাফিক গ্লাসে জল নিয়ে এক এক করে যেই ফেলত অমনি চিন্তার বুদবুদেরা গ্লাসের জলের মধ্যে থেকে সেই মানুষটির মাথায় যেত চলে। আর ঠিক তক্ষুণি সেই মানুষটি পাড়ি দিত চিন্তার কল্পলোকে।

ছোট্ট অপু একদিন সেই দোকানের খোঁজ পেল। তার অনেক দিনের সাধ পাখি হয়ে উড়ে মেঘেদের কাছে যাবার; নীলচে সবুজ "স্ফটিক"নামের লজেন্স-ক্রিস্টালের পাউচ কিনে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। বুড়োর কথামত এক গ্লাস জল নিয়ে যেই একদানা ক্রিস্টাল জলে ফেলা অমনি অপু পাড়ি দিল পাখির বেশ ধরে স্বপ্নের কল্পনায়। মাছরাঙার নীলটুকু,কাঠঠোকরার হলদে টুকু, টিয়ার ঠোঁটের লালটুকু নিয়ে অপু হল ছোট্ট পাখি টুনিয়া। শিস দিয়ে গান গাইতে গাইতে টুনিয়া উড়ে গেল মেঘের বাড়ি। অনেক দিন ধরেই অপুর মা বলছিল বৃষ্টিহীনতা আর খরার কথা। মেঘের কাছে গিয়ে টুনিয়া গান শুনিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে মেঘকে নিয়ে এল নিজের বাড়ির ছাদের মাথায় আর শুরু হল ঝমাঝম বৃষ্টি।

ছোট্ট মেয়ে তাথৈ সমুদ্রের নীচে দ্বীপে পাড়ি দিতে চায়। তাথৈ সেই দোকানে গিয়ে কমলা রঙয়ের "রম্বিক"নামের ক্রিস্টাল কিনে নিয়ে এল আর জলে ফেলতেই চিন্তার বুদবুদেরা তাথৈকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমুদ্রের নীচে। ছোট ছোট সি এনিমন, কোরাল, হাইড্রা আর এলগিদের সাথে তার বন্ধুত্ব হল। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল ঝিনুকের পেটে মুক্তোর কথা। কিন্তু কোনোদিন তা চোখে দেখেনি সে। খুব ইচ্ছে হত হাতে করে দেখার। নীচে গিয়ে দেখে কত কত ঝিনুক। ঢাকনা খুলে পেটে করে পেল্লায় মুক্তো নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। দুচোখ ভরে তা দেখতে দেখতে হঠাত্ তাথৈ ভাবল "আমি যদি এমন একটা মুক্তো হতে পারতাম"। যেমনি ভাবা অমনি একটা বিরাট গোলাপী ঝিনুক তার দিকে ছুটে এসে বলল "আজ থেকে তুমি হলে এই জলমন্ডলের রাণী। তোমার নাম আমি দিলাম মুক্তা, এস আমার কোলে" আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুক্তারাণী ঝিনুকের কোলে বসে পড়ল। আর তখুনি আর সব জলদেশের বন্ধুরা তাকে ঘিরে হৈচৈ করতে লাগল, নাচতে লাগল, গাইতে লাগল। মুক্তা তাদের বলল যাবে তোমরা আমার বাড়ির বাগানে? একটা ছোট্ট লিলিপুলে থাকবে। আমার সাথে রোজ খেলবে এই ভাবে। রাণীর কথা কি আর অমান্য করা যায় সব ছোট বড় ঝিনুকেরা, মস-ফার্ণ, শাঁখেরা অমনি রাজী হয়ে গেল। তাথৈ তাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাগানের লিলিপুলে ছেড়ে দিল। অনেকদিনের শখ তার পূর্ণ হল।

অপু, তাথৈ স্কুলে গিয়ে সব বন্ধুদের তাদের নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলল। স্কুলের টিচারদেরও বলল সব। একজন টিচার দোকানের নাম জিগেস করল। তার অনেকদিনের সাধ চাঁদে যাবার। তা তিনি রাস্তা চিনে সেই "থট-শপে" গেলেন। সেখানে গিয়ে চিন্তামণির কাছ থেকে বেগণি রঙের "কিউবিক" নামের ক্রিস্টালটি পছন্দ করে কিনে ফেললেন। বুড়োকে টিচার এবার প্রশ্ন শুরু করলেন। আচ্ছা আমি তাহলে সত্যি সত্যিই আমার শখ পূরণ করতে পারবতো এই লজেন্স-ক্রিস্টালের সাহায্যে? যদি না হয় আমার কিন্তু পয়সা ফেরত চাইই-চাই। আমার কোনো বিপদ হবে নাতো?"আরো বললেন " আচ্ছা জলে দিলেই হবে? এতো মনে হচ্ছে গ্যাঁজাখুরির গল্পের মত। আমি আবার ফিরতে পারবো তো এই

পৃথিবীতে? ইত্যাদি ইত্যাদি ..."বুড়ো চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে বললেন " আচ্ছা বাপু, তোমার যখন এতই চিন্তা তখন কেন আমার দোকানে আসা? আমি কি আর তোমার মত খদ্দেরের জন্যে সে কোন সূদুর থেকে এই সব লজেন্স নিয়ে এসে বিক্রি করি? অপু, তাথৈ এদের মত শিশুরা যাদের আমার কথার ওপর অগাধ আস্থা আর যারা শুধু বিশ্বাস করে আমাকে তাদের জন্যই আমি বেচি। তাই তারা ফলও পায়। তুমি চাইলে তাই বিক্রি করলাম ঐ বেগণি লজেন্স-ক্রিস্টাল গুলো। এই নাও তোমার পয়সা ফেরত, আমার জিনিস দিয়ে দাও আমাকে"

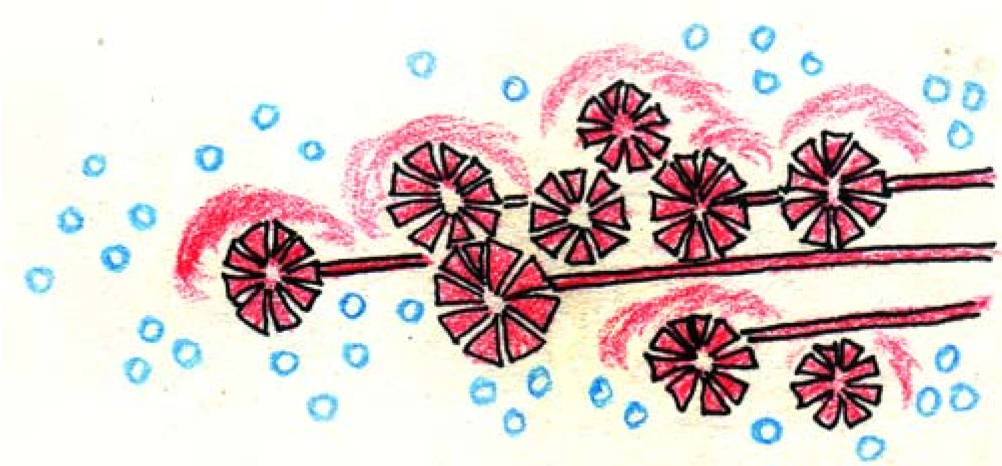

এমনি করে চিন্তামণির রঙিন দিন গুলো কাটতে থাকে একে একে। হঠাত সে ভাবল আচ্ছা আমিও তো এমন করে পৌঁছে যেতে পারি আমার ড্রিমল্যান্ড স্বর্গপুরের দরজায়। আমার তো কেউ কোথাও নেই; আমার জন্যে তো ভাববার ও কেউ নেই; আমি মরে গেলে কাঁদবার ও কেউ নেই; তাহলে দেখি না আমি যদি যেতে পারি চিরকালের মত সেখানে। আর শুনেছি সেখানে গেলে আর জন্ম হয় না। আর যুগযুগ ধরে মানুষের বিশ্বাস এই যে যারা ভাল কাজ করে তারা নাকি স্বর্গে যায়। আর চিন্তামণি জ্ঞানত: কোনো খারাপ কাজ করেনি কোনোদিন। মিথ্যে বলেনি, লোক ঠকায়নি, মানুষকে হিংসে করেনি। তাহলে সেও তো পৌঁছে যেতে পারে সেই স্বর্গদ্বারে। ব্যাস, যেই ভাবা অমনি খুলে গেল একটা বয়ামের ঢাকনা। বয়ামের লেবেলে লেখা "কসমিক", রঙ টুকটুকে লাল। বয়ামের মুখ থেকে উঠে আসছে একটা স্টিক আর তার থেকে ছোট ছোট লাল ফুল স্বচ্ছ পাপড়ি মেলে চিন্তামণির দিকে চাইছে, ঘরের মধ্যে জোছনার আলো চুঁইয়ে পড়েছে সেই পাপড়িতে আর ফুল গুলো ঝলমল করে উঠছে, যেন বলছে "এস, চল আমার সাথে, তোমার এবার যাবার সময়"। চিন্তামণি উঠে ফুলের কাছে গেল। হাতে করে একটা ফুল নিল আর এক গ্লাস জলে ফেলল সেই লজেন্স-ক্রিস্টালের লাল ফুলটিকে ; সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার বুদবুদেরা চিন্তামণিকে নিয়ে চলল স্বর্গের দিকে। যেতে যেতে সে ছুঁয়ে দেখল আকাশের নীল রঙ, পাহাড়ের গাছেদের সবুজ রঙ, সূর্যের হলুদ-কমলা রঙ মেখে নিল বেশ করে। একটা বিশাল গুহার মধ্যে পৌঁছাল সে। যেখানে একধারে ঝরণার জল ওপরে সাদা কিন্তু ঝরে পড়ার মুখে নীল। কোথাও বা ফোয়ারা উঠছে মাটি থেকে লাল রঙের, লাল নীল ফুলেরা ফুটছে সবেমাত্র তাদের কুঁড়ি থেকে। ফুলের পাপড়ি যে এই ভাবে চোখের সামনে খোলে তা দেখে চিন্তামণির আনন্দ আর ধরে না। এইবার সে দেখতে পেল বিশালাকার ঝুলন্ত স্ট্যালাকটাইটের পাহাড়। মনে পড়ে গেল কেমিস্ট্রি বইতে ছবি দেখেছিল। কিছুদূর গিয়েই চোখে পড়ল স্ট্যালাগমাইটের প্রোথিত স্তম্ভ। ক্রিস্টাল নিয়ে গবেষণা করতে করতে, পড়াশুনো করতে করতে অনেক দিনের ইচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ক্রিস্টালাইজেশনের

কারসাজিতে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের দেশে যাবার। এই বুঝি তার স্বর্গের ঠিকানা। সে সত্যি আজ পৌঁছে গেল স্বর্গের আঙিনায়।

ইন্দিরা মুখার্জি
কলকাতা

ভীতুর ডিম

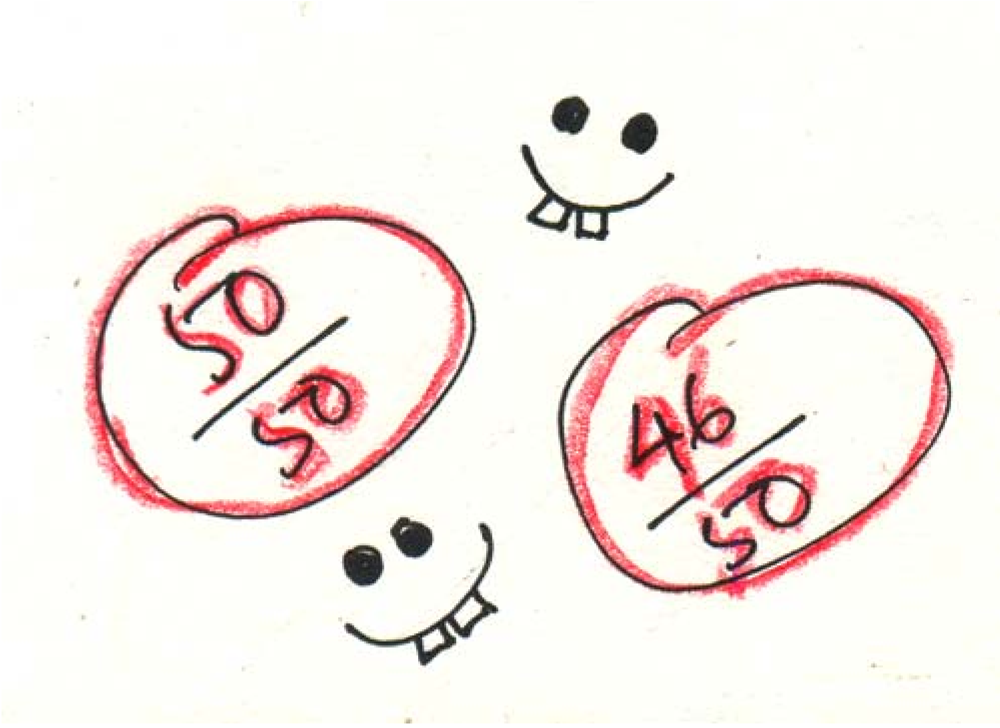

ছুটি পড়ে গেছে। পূজোর ছুটি। ঘরে বসে থাকতে নীলুর একটুও ইচ্ছে করছে না। ইস্কুলটাই ওর বেশি ভাল লাগে। কত বন্ধু বান্ধব। কত হইচই করার জায়গা। কত মাঠ। গাছপালা। লুকনোর জায়গা। কি নেই? মাঝেমধ্যে বেরিয়ে টুকটাক খাওয়া। বাড়িতে সে মজা আর কোথায়। সারাদিন তো আর মা

বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। তারপরে একে তো গাদাখানেক ছুটির কাজ আর ইস্কুল খুললেই পরীক্ষা। পরীক্ষাটরীক্ষার কথা এমনিতে তার বড় একটা মনে থাকে না। কিন্তু আজকাল ইস্কুলে ঘড়ি ঘড়ি পরীক্ষা হচ্ছে। আর কপালে জুটেছে এক মাস্টারমশাই। রোজ একবার করে পরীক্ষার কথা মনে না করিয়ে দিলে আর তার চলছে না। কালকে ভুল করে একবার জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, 'মাস্টারমশাই আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন না?'

'বেড়াতে? না। খামোকা বেড়াতেই যাবো কেন?'

আমতা আমতা করে নীলু বলেছিল, 'না মানে ঐ পূজোর ছুটি আসছে কিনা। তাই'

মাস্টারমশাই আচ্ছা করে কানটা মুলে বললেন, 'ও, আমি বেড়াতে গেলে ফাঁকি দেওয়ার খুব সুবিধে হয় তাই না?'

নীলু যত না না করে, মাস্টারমশাই তত হাসেন। অবশেষে নীলু যখন ছাড়া পেল মাস্টারমশাইয়ের খপ্পর থেকে তখন কান টনটন করছে। বোধহয় কানের লতিটুকুও ফুটফুটে লাল হয়ে গেছিল মনে হয়।

'সাত প্রশ্নমালার সবকটা অঙ্ক করে রাখবে। আর হ্যাঁ ভুল যেন না হয়'

নীলু ভাল ছেলের মত ঘাড় নেড়েছিল, 'হ্যাঁ মাস্টারমশাই। করে রাখব'

'আর শোন, আমি যদি কোথাও যাইও। তাহলে তুমি পাহারায় থাকবে। বিকেলে একঘন্টা ছাড়া বাড়ি থেকে খেলতে বেরোন যাবে না'

নীলুর একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, 'কে পাহারা দেবে স্যার?'

কিন্তু পারল না। গলা শুকিয়ে এল। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে পাছে আবার একটা কানমলা খায়। নিশ্চয়ই মাস্টারমশাই বাবাকে কিছু বলে যাবেন। তবে বাবা তো আর সারাদিন বাড়িতে থেকে পাহারা দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই মাকেই বলে যাবে। মাকে ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব। আর একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে মা আর কি করবে। মাঠ থেকে তো আর ধরে আনতে পারবে না। এই ভেবে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রান্সলেশনটা করতে যাচ্ছিল।

মাস্টারমশাই আবার গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, 'আর হ্যাঁ, মনে কর না যে তোমার বাড়ির লোক তোমায় পাহারা দেবে। তোমার মত বিচ্ছু ছেলে কি করে বাড়ি থেকে পালায় তা আমি খুব ভালো করে জানি'

নীলু ভয়ে ভয়ে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। ভাবটা এমন যে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। অবশ্য অবাক যে হয়নি তাও না। মা পাহারা দেবে না তো আর কেই বা আছে তার ওপর নজর রাখার জন্য।

'তাদের তুমি দেখতে পাবে না। দেখতে পাওয়াও যায় না। যদি কথা শুনে চল, তাহলে কিচ্ছুটি হবে না। কিন্তু যদি সে দেখে পড়া ফেলে পালাচ্ছ, তাহলে পটাপট মাথার গাঁট্টা পড়বে। বুঝলে?'
মাথা নাড়ল নীল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'স্যার, ভূত টুত নয়তো?'

মাস্টারমশাই হাসলেন। তাঁর পান খাওয়া ছোপ ছোপ দাঁতগুলো দেখা গেল। হাসতে হাসতে তাঁর মুখ বেঁকে গেল। বললেন, 'ওরা আমার পোষা। বুঝলি? হা হা হা। ওরা ভাল করে কানও মুলতে পারে'। হাসি চলতেই থাকল। নীলুর আর দশটা ব্যাপারে সাহস থাকলে কি হবে, এই একটা জায়গায় সাহসটা কেমন চুপসে আসে। সকালবেলায় অঙ্ক খাতাটা খুলে সে এইসবই ভাবছিল। মা এসে একবার দেখেও গেল। মাথায় হাতবুলিয়ে বলে গেল, 'বাহ পড়ায় বেশ মন বসেছে দেখছি। এই তো আমার লক্ষী ছেলে' ভাগ্যিস মা খাতাটা দেখেনি। দেখলেই বুঝতে পারত অঙ্ক সেভাবে এগুচ্ছে না। এই প্রশ্নমালায় আছে ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশটা মাস্টারমশাই বুঝিয়েছেন বটে। কিন্তু সে খুব একটা ভাল বুঝতে পারেনি। কারন সেটা মাস্টারমশাই বলেছেন ভূতের ভয় দেখানোর পর। সব মিলিয়ে সাতচল্লিশটা অঙ্ক আছে। কি করে শেষ হবে কে জানে? মনে হচ্ছে কপালে নাচছে ছপটি। না না, অতদূর যেতে হবে কেন? এই কানমলা আর গাঁট্টা পড়ল বলে। নীলু ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। হাত পা আরও একবার ভয়ে কেঁপে উঠল। ভয় এতটাই যে সেভাবে জানলার বাইরেই সে তাকাচ্ছে না। কোথা থেকে নজর রাখছে কে জানে? প্রথম পাঁচটা ছোটখাট অঙ্ক ছিল। বিস্তর কাটাকুটির পর সেগুলো নেমেছে। এর পর থেকেই প্রশ্নের অঙ্ক।

তিন নম্বর অঙ্কটা বলছে – একটা ঝুড়িতে কিছু আম ছিল। তার চারভাগের একভাগ পচে গেল। বাকীগুলোর মধ্যে তিনভাগের একভাগ ছোটদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পরেও পাঁচটা আম পড়ে রইল। তাহলে প্রথমে ঝুড়িতে কতগুলো আম ছিল?

অঙ্কটা নয় নয় করে বার পাঁচেক অন্ততঃ পড়েছে নীলু। কিছু লাভ হয়নি। আরো মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থাকার পরেও অঙ্কটা নামল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আজকে আর কপালের মারটা কেউ আটকাতে পারছে না। বাইরে কি সুন্দর আবহাওয়া। মিঠেকড়া রোদ। পূজো আসছে বলে হালকা শীত শীতও পড়ে যাচ্ছে। ইস্কুল ছুটি। খেলাধূলোর পক্ষে এই তো আদর্শ। এগারটা নাগাদ ডাকতে এসেছিল পচা, কম্বল আর চুটকিরা। ওদের ফিরিয়ে দিয়েছে নীলু। ওরা এখন কোথায় গেছে কে জানে। সদ্য সদ্য সাইকেল চালাতে শিখেছে সবাই। নীলুকেও ওর বাবা একটা ছোট দুচাকার লাল সাইকেল কিনে দিয়েছেন দু মাস হল। সাইকেল নিয়েই কি দূরে কোথাও গেল ওরা?

অঙ্কখাতাটা বন্ধই করে ফেলল নীলু। অন্ততঃ কয়েকটা ট্রান্সলেশন করে ফেলা যাক। কালকে বারোটার মধ্যে তিনটে কাটা গেছে। পড়াশুনোয় সে কোনদিনই খুব ভাল একটা না। আর সত্যি কথা বলতে ইচ্ছেও করে না। দিনরাত বসে বসে পড়ার কথা সে ভাবতেও ইচ্ছে করে না। ট্রান্সলেশনের খাতাটা খুলে প্রথমটা দেখেই চমকে গেল সে। পলাশ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ট্রান্সলেশন পড়ে রইল, ঘুড়িটাই বরং বেশী করে ডাকতে লাগল তাকে। কিন্তু এটা একটু ভুল দিয়েছেন মনে হয় মাস্টারমশাই। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে কেউ হোঁচট খায় নাকি আবার? ধুস। তাহলে নেহাতই আনাড়ি হবে। কত ঘুড়ি উড়িয়েছে সে, কতগুলো কেটেছে। কিন্তু কই হোঁচট তো কোনদিনও খায়নি। নাহ এটা ভুলই করেছেন মাস্টারমশাই। তারপরেই খেয়াল হল সমস্যাটা। হোঁচট খাওয়া ইংরাজীটা আবার কি রে? অনেক মাথা চুলকেও কিছুতেই মনে পড়ল না। ওয়ার্ডবুকটা তার কিছুতেই মুখস্থ হতে চায় না। কোথায় ছুটিটা চুটিয়ে মজা করে কাটাবে তা না ভূতের ভয়ে পড়তে বসেছে। বন্ধুদের কাউকে বলাও যাবে না। কেউ তো আর বিশ্বাস করবে না এইসব। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলবে, 'দূর বোকা, ভূত বলে কি আবার সত্যিই কিছু আছে নাকি?'

'আছে হে আছে', কে যেন একটা খসখস করে বলে উঠল।

'কে, কে কথা বললে?', নীলু একটু ভয়ে ভয়েই চারদিকে তাকাল।

'কেন আমি'

'কে, কে তুমি?', নীলুর গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

'আহ মেলা ফ্যাচফ্যাচ করো না তো। এই তো এতক্ষন আমার কথাই ভাবছিলে। আর এলেই দোষ'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'দেখতে পেলে কি হত শুনি? এমনিতেই তো ভয়ে আধমরা হয়ে আছো'

'আমি কিন্তু ঠিক করেই পড়াশুনো করছি'

সেই আওয়াজটা খেঁকিয়ে উঠল, 'কেমন করছ তা দেখতেই পারছি। বই নিয়ে শুধু বসেই আছো সকাল থেকে। কাজের কাজ কিছু করনি। তোমার মাস্টার ঠিকই বলেছে সে। তোমার কপালে গাঁট্টাই লেখা আছে'

'আমায় গাঁট্টা মারতে এসেছ বুঝি? কই খেলতে তো যাইনি। অনেক চেষ্টা করলাম। আমি যে সত্যিই অঙ্কগুলো পারছি না-'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, 'থাক থাক আর আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে হবে না। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে আছে অঙ্ক হবে কোথা থেকে শুনি? আর আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছোট ছোট পুঁচকে ছেলেদের মাথায় গাঁট্টা মেরে বেড়াই আর কি!'

'তবে?'

'তবে কি?'

'না মানে, আমাকে গাঁট্টা মারতে আসনি। তাহলে এলে কেন তাই জিজ্ঞেস করছি-'

'বলি প্রশ্ন না করলে তোমার চলে না, না?'

নীলু চুপ করে রইল। ভূতটা যেই হোক, তাকে গাঁট্টা মারতে যখন আসেনি তখন তাকে এত প্রশ্ন না করাই বোধহয় ভাল। ট্রান্সলেশনের খাতাটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। হাতে নিল পেন্সিলটা। কিন্তু আসেপাশে যখন একটা ভূত উড়ে বেড়াচ্ছে, তখন কি আর ট্রান্সলেশন করা যায়?

'তোমার যে দেখি আঠেরো মাসে বছর। বলি ঐ কটা অঙ্ক আর ট্রান্সলেশন করতে কি তিন ঘন্টা লাগে নাকি হে? আমি হলে দশ মিনিটে শেষ করে খেলতে চলে যেতুম'

'তুমি খুব ভাল অঙ্ক আর ট্রান্সলেশন জানো বুঝি?'

'ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান সব জানি। এমন সব জিনিস জানি যা তোমাদের মাস্টাররাও জানে না। বুঝলে?'

নীলু সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এতই যদি সব জানো তাহলে আমাকে একটু দেখি দাও না?'

সেই আওয়াজটা আবার খিঁচিয়ে উঠল, 'বলি ফরমায়েশ করতে পেলে বুঝি আর কিছু চাও না? আমি এখন অঙ্ক কষে দিলে, ট্রান্সলেশন করে দিলে পরীক্ষার খাতায় কি লিখে আসবে? তখন তো গাড্ডু পাবে আর আবার ঐ মাস্টারের কাছে কানমলা খাবে'

নীলু প্রথমে খুব আশা পেয়েছিল কথাগুলো শুনে। আবার সে দমে গেল। ঠিকই তো। এমনিতে যতটুকু সে পড়ে তাইই পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে পারে না। পরীক্ষার হলে ঢুকে সব কেমন মাথা থেকে উড়ে যায়। অঙ্ক পরীক্ষার দিন তো কেউ যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে বুকের ভেতর। হাতের গোনা ভুল হয়ে যায়, বিয়োগ করতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যায়। একপাতায় পাঁচ পরের পাতায় গিয়ে সাত হয়ে যায়। যে যেরকম পরীক্ষা দেবে, তার রেজাল্ট তো সেরকমই হবে – কারো কানমোলা, কারো বেতের বাড়ি, কারো বা মন্ডা মিঠাই। দূর দূর, পরীক্ষার কথা মনে পড়তেই সে একটু মুষড়ে পড়ল। চোখে একফোঁটা জলও এসে গেল তার। সে বলল, 'আমায় সবাই বড্ড মারে'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। আমার কাছে আর কাঁদুনি গাইতে হবে না। তোমার কি অবস্থা আমি খুব ভালো করে জানি। এখন যা বলছি তা মন দিয়ে শোন–'

নীলু চোখের জল মুছে ঘাড় নাড়ল।

'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেহাত কম নয়। কিন্তু মারের চোটে আর ভয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। বুঝলে? কিন্তু পুরোটা গন্ডগোল হয়নি। আমি এখন চাইলে ঠিক করে দিতে পারি। তোমাকে পরখ করতেই এসেছিলাম আমি। তুমি এখনো অবধি সব সত্যি কথা বলেছ। সেই জন্যেই তুমি পুরষ্কার পাবে। আর তোমার মাস্টারমশাই পাবেন গাঁট্টা'

নীলু চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে আর কিচ্ছুই না। আমাদের নামে কেউই উল্টোপাল্টা বলে বেড়াক আমরা পছন্দ করি না। কালকে তোমাদের লেবুগাছে গন্ধ শুঁকতে এসেছিলুম। দেখি মাস্টারটা যা নয় তাই বলছে। আমরা মাঝে মধ্যে লোকজনকে ভয় দেখাই বটে, তবে ঐসব আমাদের কাজ না। দেখাতে হয় বলে। আর আমাদের পোষ মানিয়ে কেউ ঘরের কাজ করিয়ে নেবে, তেমন জিনিস আমরা নই। বুঝলে?'

'এখন কি হবে?'

'কি আবার হবে, তোমার মাস্টারমশাই আর তোমাকে পড়াতে আসতে পারবেন না দুমাস'

'কেন উনি বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?'

'না না বেড়াতে যাবেন কেন? একটু শক পেয়েছেন। কালকে বড়বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চুপিচুপি বললুম গিয়ে – ভূতের গাঁট্টা খেয়েছেন কখনো। ব্যস তাতেই কাজ হয়ে গেছে। যাইহোক, যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই। কক্ষনো মিথ্যে বলবে না। আর মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। ঠিক আছে? নইলে কিন্তু আমি এসে সত্যি সত্যিই গাঁট্টা লাগিয়ে যাবো। এপাড়ার বেল, লেবুগাছগুলোয় আমি প্রায়ই আসি'

নীলু খুশি হয়ে বলল, 'তোমায় কি বলে ডাকবো?'

'খাসনবিশ দাদা', এই বলে একটা হুশ করে আওয়াজ হল। নীলু একটু থ্যাঙ্ক ইউ বলতে যাবে তার আগেই। ওদিকে শুনতে পেল মা ডাকছে চান করার জন্য। নীলু খুশি মনে উঠে পড়ল।

মা বললেন, 'হ্যাঁরে নীলু, তোকে সকালবেলা বলা হয়নি। কাল রাত্তিরে নাকি তোর মাস্টারমশাই পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। এখন পুরো বিছানায় শোয়া। অনেকদিন নাকি পড়াতে আসতে পারবেন না। হ্যাঁ রে, তুই কটা দিন নিজে নিজে পড়তে পারবি তো?'

মাকে জড়িয়ে ধরে নীলু বলল, 'হ্যাঁ মা, খুব পারবো। আমি এখন থেকে ঠিক নিজে নিজেই পড়তে পারবো'

মাও একটু মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভালো করে পড়িস বাবা। এত কম নম্বর পাস প্রত্যেকবার বলেই তো আমাদের চিন্তা-'

দুমাস পরে যখন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল তখন দেখা গেল নীলু ক্লাসে ফার্স্ট। অঙ্কে পঞ্চাশে পঞ্চাশ। ইংরাজীতে তেতাল্লিশ। ভূগোলে চল্লিশ। ক্লাসের নবীনস্যার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাশ ব্যাটা। কি করেছিস রে তুই নীলু?'

নীলু কিছু জবাব দিল না। আর কেউ না জানুক, সে নিজে তো জানে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসেই টের পেয়েছিল ব্যাপারটা। অঙ্কগুলো দেখা মাত্র জলের মত নেমে যাচ্ছিল। খাতায় অঙ্ক না করেও সে বলে দিতে পারছিল উত্তরটা। তেমনি ট্রান্সলেশনগুলোও। পুরোন পড়াগুলোও ছবির মত মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আজ মার্কশিটটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে ফিসফিস করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ খাসনবিশ দাদা।'

মাথায় কে যেন হালকা করে গাঁট্টা মেরে চলে গেল। ফাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে উঠল, 'ভীতুর ডিম কোথাকার-'

অভ্র পাল
কার্ডিফ, ওয়েল্‌স্‌, যুক্তরাজ্য

পূজোর চিঠি

প্রিয় দাদুভাই,

কি করছো তুমি? এখন? আমার একদম ভাল্লাগছেনা মনটা। কি করি কি করি উশখুশানির মাঝেই হাল্কা নীলচে ইনল্যান্ড নিয়ে বসে গেছি। বুকের তলায় বাঁধানো খাতার ওপরে ইনল্যান্ড রেখে লিখতে বসেছি তোমায় এখন,তোমার পাঠানো কালিপেনটা সুলেখাতে চুবিয়ে।

ঘড়িতে দশটার ঘন্টা সবে পড়লো ট্যাং ট্যাং করে। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেছে আধ ঘন্টা আগেই। অন্য সময় হলে এসময় ফিটফাট হয়ে সাইকেল নিয়ে চোঁ করে ...স্কুলে। কিন্তু আমার কলার ওঁচানো লাল টুকটুকে সাধের সাইকেলটা গোঁত্তা খেয়ে মুখ ভার করে উঠোনের চৌবাচ্চার পাশে বন্দী। আমার জ্বর! বাইরে ঘরের হলদেটে সানমাইকারে মোড়া উঁচু ডিভানের বেশ তুলতুলে গদিতে আমি বন্দী,সামনে জাল লাগানো জানলার গরাদ আর গরাদের ওপারে মেঘলাটে রোদ আর ঝুপঝুপে বৃষ্টির লুকোচুরি,মাঝে মাঝে বাগান ভরা জল আর জলে কিলবিলে তেচোখা মাছ আর সাঁই করে টেঁরিয়ে বেঁকিয়ে চলে যাওয়া হেলে সাপ। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। অন্যবারের মতো। আকাশের মুখভার কি আমায় দেখেই! কে জানে? জানলায় বসেই বাইরেটা দেখা... গেলোবারে দেখা অমল ও দইওয়ালা নাটকের অমলের মতো। ফিক করে হাসি পেলো। উঁচু ক্লাসের বাংলার স্যার গোপাল জ্যেঠু একতাড়া কাগজ দেখে এমন জোরে পেছন থেকে ডায়লগ গুলো বলে দিচ্ছিলো যে যারা নাটক করছে তাদের থেকে জ্যেঠুর আওয়াজ বেশী পাওয়া যাচ্ছিলো। স্যার দিদিমনিরাও তো হেসেই কুটিপাটি। আমিও যেন সেই অমল। কিন্তু আমার এই জানলাটা একেবারেই রাস্তার ওপরে নয়। তারওপর জানলার ঠিক ওপারেই...বারান্দায় টাঙানো তারে, মা সার সার করে শাড়ী মেলে দিয়েছে শুকোতে,এই মেঘ বাদলের দিনে। টুপ টুপ করে জল পড়ছে লাল নীল হলদে শাড়ী বেয়ে...চুঁইয়ে চুঁইয়ে। লোহার গেট ছাড়া অনেকটাই দেখা যাচ্ছে না বাইরের। মনটা কি করি কি করি করছে আবার আনচানও করছে শরীর খারাপে।

ঠিক কালকে, এমন সময়ে গেটে সাইকেলের কিড়িং!চেনা শব্দ।মোটাসোটা কাকুটা,খাঁকি ফুল শার্ট আর ফুল প্যান্টের।সাইকেলের দুপাশে কালো ইয়াব্বড় ব্যাগে আমাদের স্বপ্ন দিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গেটের সামনে সাইকেল থামিয়ে ঐ একটা আওয়াজে মনটা খুশীতে ঝলমলিয়ে দেয়...কিড়িং।কাকুর নাম জিজ্ঞেস করিনি কখনো।কেন?জানিনা,ভাবিইনি কখনো হয়তো।গা থেকে লেপ ছেড়ে এক দৌড়ে গেটের সামনে। মুখে এক ফালি মায়াবী হাসি নিয়ে গেটের লোহার শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাকে বাড়িয়ে দিলো আমার অদেখা জানলা,এমাসের নতুন শুকতারা।আমার সব মুখভার সূর্য্য ওঠা রোদের মতো ঝকঝকিয়ে হেসে ফেললো।নাচতে নাচতে বাইরে ঘরের ডিভানে আবার।ততক্ষনে মা এসে গেছে হাত মুছতে মুছতে। রান্না করছিলো মাগুর মাছের ঝোল, হাল্কা গোলমরিচ দিয়ে।'বাবলাই... তুই খালি পায়ে কেনো বেরোলি? তোকে বললাম না হাওয়াই চটি পরে বেরোতে?আবার জ্বরে পড়লে কি হবে?' আমার কানেই ঢুকছেনা মায়ের রোজকার ঢিস্যুম ঢিস্যুম।আমি একমনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি নতুন শুকতারার গন্ধ শুঁকতে। বাঁটুলের বুকফোলানো অবিশ্বাস্য কান্ড কারখানা পড়ে যা হাসি পায় না!আর হাঁদাটার ওপর খুব রাগ হয়;ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিলে ভালো হতো।অনেকটা আমাদের কেল্টুদার মতো।কেল্টুদার যেমন যত কেদ্দানি নন্টে-ফন্টের ওপর!তেমনি হাঁদাটার খালি ধান্দা বেকায়দায় ফেলা ভোঁদাকে!আর ভোঁদাটা কিন্তু ভীষন মিচকে; কেমন বোকা বোকা মুখ করে থাকে আর একদম শেষে গিয়ে পট করে জিতে গিয়ে কিরকম বিজ্ঞের হাসি দেয়!তখন হাঁদার মুখটা দেখে যা হাসি পায় না!দাদুমনির চিঠি পড়ে ফেলি মন দিয়ে।তারপর পাতা ওল্টাই... ফর্ ফর্।এপাতা ওপাতা,কোনটা যে আগে পড়ি!এমন সময় মায়ের গলার আওয়াজ।মা চান করতে ডাকছে!হিটারে হাঁড়ি ভর্তি গরম জল বাথরুমের বালতিতে ঢেলে,চৌবাচ্চার জলের সাথে মিশিয়ে।খোলা শুকতারাটা বিছানায় উপুর করে ফেলে রেখে উঠে পড়লাম আড়মোড়া দিয়ে।আজ এটুকুই।আমার এত্তো ভালবাসা নিও।ও আরেকটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। জানোতো, মা সেদিন কাঁদছিলো তোমার কথা বলে আর বলছিলো তোমার নাকি অসুখ হয়েছে? কি অসুখ গো?জ্বর? সেতো আমারো হয়েছে! বাবা ছুটি পেলেই আমরা তোমাকে দেখতে যাবো, মা বলছিলো।কিন্তু বাবার অফিসের খুব চাপ এখন,বাবা বলছিলো।খুব রাগ হয় বাবার ওপর;খালি কাজ...কাজ... কাজ!তবে পূজোতে তো যাচ্ছিই তোমার কাছে।এখনো মা নিয়ে যায় নি গো কলোনী মার্কেটের ক্যালকাটা টেলরে। শার্ট আর প্যান্টের পিসগুলো আলমারিতেই বন্দী এখনো।তোমার পূজোর বাজার হয়ে গেছে দাদুভাই? কেমন আছে সবাই ওখানে?

ইতি তোমার বাপন

স্নেহের বাপন,

তোর চিঠি পেয়েই মনটা ভালো হয়ে যায়।এখানে সবাই ভালো।নারে এবাড়ীর পূজোর বাজার হয়নি এখনো।এ্যাই জানিস তো,তোর বড়মামা একটা হাঁসের বাসা তৈরী করেছে বাড়ীর ভেতরে।বেশ বড়সড় আর লম্বাটে।ভেতরে হাঁসগুলো প্যাঁকপ্যাঁকাচ্ছে রাত দিন।তোর দিদা মাঝে খুব রেগে গেছিলো।একদিন একটা হাঁস নাকি ঠোঁট বাগিয়ে তেড়ে এসেছিলো তোর দিদার দিকে।সেই থেকে তোর দিদা আর ওই ঘরে ওদের খেতে দিতে যায়না।তোর বড়মামাকে তো জানিস,রোজ সক্কালে উঠে তিনতলার ঘরে পূজো টুজো সেরে লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে নিয়ে নীচতলার মাঠ পেরিয়ে পুকুরপাড়ে যায় ডুবকি লাগাতে।ভুস ভুস করে চারপাঁচটা ডুব মেরে ঠাকুর প্রনাম সেরে,ওর সাধের হাঁসেদের জন্য কেঁচো,গেঁড়ি গুগলি, পোকা মাকড় জোগাড় করতে যায় জেলেদের কাছে।জেলেরা এর মধ্যেই সপাং করে নীল জাল ছড়িয়ে দিয়েছে পুকুরের জলে আর ছোট ছোট ভেলা নিয়ে সারা পুকুর ভেসে বেড়াচ্ছে মাছ ধরার জন্য।আমি দোতলা ঘরের জানলা দিয়ে সব দেখি।সক্কালের হলদেটে রোদ্দুর পুকুরের সবুজ পানা কচুরী ঢাকা জলে পড়ে চক চক করে ওঠে আর কালো কালো জেলেদের নীলচে জালে রুপোলী মাছে রোদের হলদে রঙ পিছলে গিয়ে চোখটা ধাঁধিয়ে দেয় জানিস।তোর বড়মামা সদর দরজা খুলে সোজা ঢুকে যায় হাঁসেদের ঘরে।সকাল সকাল খাবার দাবার খেয়ে হাঁসগুলোর সে কি প্যাঁকপ্যাঁকানি রে!আমার এখন নীচে যাওয়া বারণ,তাই আমি ওপর সব দেখি বাপন।নারে সোনা আমার জ্বর জ্বালা হয়নি।আমার শরীরে একটা কালচে ঘা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরের বেশীরভাগ ঘরে।রক্তকে দূষিত করে দিয়েছে ওই ঘা-টা।এই ঘা-এর কোনো চিকিতসে এখনো নেই দাদু।আমি তাই এখন জীবনটাকে বেশী বেশী করে উপভোগ করছি।খুব ছোট ছোট জিনিষেও খুব মজা পাওয়ার চেষ্টা করছি।আর আশ্চর্য্য কি জানিস,মজা পাচ্ছিও!এই ছুটির দিনগুলোতেই আমি বুঝেছি আরো বেশী করে আমাদের হাতেই আছে আমরা কিসে মজা পাবো আর কিসে মজা পাবোনা এর চাবিকাঠি!আমি যখন তোর মতো ছিলাম,এই ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়তাম,তোর মতো আরাম তো আমি পাইনি কখনো।আমার জীবন ছিলো কষ্টে ভরা।আমার স্কুল মাষ্টার বাবা সিল্কের ব্যবসা করতে গিয়ে ভিটে মাটি সর্বস্ব খুইয়ে বসে।আর আমি পড়াশোনার নেশায় মাহেশের কাছে

এক জমিদার বাড়ীর আশ্রিত হয়ে বড় হতে থাকি।সেসব বড় কষ্টের দিন রে দাদু।আমার খাওয়া হতো মন্দিরের ভোগে।আর সারাদিন জমিদার বাড়ীর নানা কাজকম্মের ফাঁকে ফাঁকে নানা পড়াশোনা।এভাবেই আমার কেটে গেছে তোর মতো বেলাটা।এখন তাই তো তোকে বলি,বড় হবার কথা ভাববিনা।বড় হলেও মজা আছে কিন্তু ছোটবেলার মজাটা সবচেয়ে সেরা মজা জানিস।ভাববি কি করে মজা করবো আরো...রোজ।আমি এখন জানি আর কিছুদিন পরেই এই পৃথিবী থেকে আমাকে চলে যেতে হবে।কেন জানিনা আমার মনে হয় আমি আবার আমার ছোটবেলায় ফিরে গেছি।তাই তো দোতলার ঘরের এই কাঠের চেয়ারটায় বসে আমি আমার ছোটবেলার আনন্দগুলোকে দেখতে চাই রোজ।কি যে মজা লাগে রে।যেন উলোটপূরাণ!বেলা বাড়লেই পুকুরের ওপারের ডোমপট্টির ছেলে গুলো ঝপাং ঝপাং করে করে লাফিয়ে পড়বে জলে,হাপুস হুপুস করে চান করবে।মাছরাঙা পাখিটাও দত্তবাড়ীর পুকুর ঘেঁষা বাঁশ ঝাড় থেকে নজর রাখবে বুদবুদকরে চোখ পিটপিটানো মাছের দিকে।সুযোগ পেলেই সোঁ করে উড়ে এসে খপ করে ধরবে কোনো মৃগেল পোনা।

রাস্তা দিয়ে হাঁকতে হাঁকতে লাল দই যাবে নীচে।লাল লাল ইট ভর্তি গাড়ী যাবে গাঁক গাঁক করে।আর কত যে লোক যায় সারাদিন,আমি শুধু দেখতেই থাকি।এই বয়সে এসে মনে হয় রবীঠাকুরেরও নিশ্চয়ই এমন দিন গেছে না হলে ডাকঘরের মতো ছবি বড়বেলায় আঁকা যায়?

বাবার ওপর রাগ করিস না রে।কত দায়িত্ব জানিস তোর বাবার?হুট করে দায়িত্ব ছেড়ে চলে এলে আমিই তো রাগ করবো।পূজোর ছুটিতে আসবি যখন অনেক কথা হবে।আমি কিন্তু তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকবো বাপন...

ইতি,দাদুভাই

প্রিয় দাদুভাই,

আর মাত্র মাসখানেক পূজোর ছুটি হতে।তোমার ঘায়ের কথা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো।বাবুল মামা তো বিরাট বড় ডাক্তার,ঠিক সারিয়ে দেবে দেখবে।আর না হলে ঘা-টাকে ঠেকিয়ে রাখতে বোলো,আমি ডাক্তার হলে ঠিক সারিয়ে দেবো তোমার ঐ দুষ্টু পচা ঘা টাকে।আর তো মাত্র কটা বছর,বলো?আমার না খুব আনন্দ হচ্ছে তোমায় দেখবো বলে।জানো দাদুভাই,এবার আমরা বেশ অন্যরকম ঝুলন করলাম।অন্যবারে তো পল্লবদের বাড়ীর টিনের দরজার পাশের ঘাসের চাঙর কেটে ঝুলঝুরে কাদা মাটি ফেলে দিয়ে উঠোনের তুলসী মঞ্চের পেছন থেকে চাঁছা শ্যাওলা দিয়ে পাহাড় বানাই... ; এবারে না ঠাম্মার একটা সাদা পুরোনো শাড়ী ছিঁড়ে বালতীভর্তি কাদায় চুবিয়ে পাহাড়ের মতো করে বসিয়েছিলাম মাটির তালের মধ্যে গোঁজা কঞ্চির ওপরে।আর সারা দিন ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়ে বিকেল নাগাদ খড়খড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে গেলে ওপরে ছিটিয়ে দিলাম চকচকে অভ্রের দানা। কি সুন্দরই না লাগছিলো।মিলন মন্দিরের বড় গেটের সামনের পাথর কুচির ঢিবি থেকে বেছে বেছে তো আগের দিনই খুব কুঁচো পাথরগুলো নিয়ে রেখেছিলাম আর সেগুলো দিয়েই তৈরী হলো আমাদের রাস্তা।রাস্তা দিয়ে হাঁটলো লালবাগের ফকির, পৌষমেলার বাউল আর ছাতা মাথার মাষ্টারমশাই।সবুজ আবীরে মাঠ হলো,সেই মাঠে কৃষ্ণনগরের মাটির চাষা ধান বুনলো।নীল আবীরে হলো পুকুর আর পুকুরে প্লাষ্টিকের হাঁস আর লাল-নী-হলদেটে রাবারের ছুটকো মাছগুলো খেলে বেড়ালো সারা ঝুলন দিনটা। রাস্তায় রাস্তায় প্লাষ্টিকের গাড়ী,মাটির গরুর গাড়ী তো ছিলোই আর ছিলো ধপধপে সাদা তাজমহল। আবার তাজমহলের সামনে যুদ্ধও লেগেছিলো জোর... সেপাই,সান্ত্রী,রাজামশাই,ঘোড়া,হাতি ... সব্বাই হাজির।আর পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে লুকোনো টেবিল ল্যাম্পের আলো, কাঁইচি দিয়ে তাক লাগিয়ে কাটা সূর্যের ওপরে ছটা মেরে রোদ্দুর দিচ্ছিলো এই পুরো সাম্রাজ্য।পাহাড়ের নীচটায় ছিলো ঘন জঙ্গল,পার্থেনিয়ামে ফুল আর পাতা লাগানো,আর ফাঁকে ফাঁকে ছিলো বাঘ,সিংহ,শেয়াল,সজারু...;মনে আছে তোমার গেলবারে মালদা থেকে তুমি কিনে দিয়েছিলে জঙ্গুলে প্যাকেটটা, মনস্কামনা মন্দিরের সামনের দোকানটা থেকে?

এখন তো জোড়তোড় ক্লাস চলছে রোজ।ডাকব্যাকের সবুজ ব্যাগটায় রোজকার সিলেবাসে ভরা

দিনগুলোকে ভরে চলে আসি স্কুলে, খাঁকি হাফ প্যান্ট আর সাদা হাত কাটা জামা পড়ে।জানো দাদুভাই বাবুয়া বলছিলো আমার নাকি মোচ উঠছে।হঠাত-কলোনীর সুজিত নাকি ওর বাবার রেজার দিয়ে মোচ চেঁচেছে।ওতে নাকি আরো বাড়বে।মা খুব বকছে এসব শুনে আমায়।বলেছে ওর সাথে না মিশতে।আহা ওর কি দোষ বলো?বড় হতে তো সবার ইচ্ছে করে।ওর হয়তো তোমার মতো দাদুভাইই নেই যে ওকে কানে কানে শিখিয়ে দেবে রয়েসয়ে বড় হওয়াই ভালো।জানো দাদুভাই চিন্টু কি করেছে?কপালে গামছা দিয়ে ঘঁষে ঘঁষে থার্ড আই বের করার চেষ্টা করেছে! বাবা আমাকে বলেছে ওসব কু সংস্কার

বলেছে,আমরা আমাদের দুটো চোখের বাইরে যে চোখটা দিয়ে সবকিছু দেখি সেটা থার্ড আই নয়,সেটা মনের চোখ!মনের চোখ কি গো?আমাকে বুঝিয়ে দিও তো ; শিগগিরি চিঠি দাও।

ইতি তোমার বাপন

ওরে আমার বাপনসোনা,

তোর চিঠিই এখন আমার মনের চোখ সেটা জানিস?না না ভ্রু কুঁচকাস না অমন করে।আসলে আমি এতোদিন দোতলার ঐ জানলার ধারের চেয়ারটাতেই সারাদিন বসতাম আর মাঝে মাঝে তোকে চিঠি লিখতাম।জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে আমি পৃথিবী দেখতাম।দিনকয়েক ঐ জানলাটা আমার চোখের বাইরে।ডাক্তারের বারণ।বলেছে আমায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে।আমি শুয়ে আছি খাটে... প্রায় সবসময়। আর গতকাল তোর ছোটমামা তিনপাহাড় থেকে ফিরেছে অনেক রাত্রে,ওখানকার সার্ভে শেষ।আজ সকালে তোর চিঠিটা আমায় দিলো আর তিনপাহাড়ের অনেক গল্প করলো।জানিস ওখানে একটা সাধু বছরের পর বছর মৌনিবাবা হয়ে লোকের পূজ্যস্থানীয় হয়ে উঠেছিলো নানা চমতকার দেখিয়ে।পরশু দুপুরে সে নাকি ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।সে নাকি উত্তরপ্রদেশের এক মস্ত বড় ডাকাত দলের চাঁই! ওসব তৃতীয় নয়ন বলে কিছু নেই রে।আর কেউ বলে দিলো আর অমনি বিশ্বাস করে নিলি,অমন মন কক্ষনো করবিনা।বেশীরভাগ লোক দুর্বল সেটা জানিস তো।কিছু করতে না পারলেই বুজরুকিতে আশ্রয় করে।সেটা না করে প্রশ্ন করবি,নিজের মনকে।কেন করবো আমি? কেন?কেন? এই কেন প্রশ্নটাই দেখবি তোর এগোনোয় পথ দেখাবে।তোর চিঠি পড়ে আমি তোকে দেখলাম আমার মনের চোখ দিয়ে। আমার কল্পনার চোখ দিয়ে।আসল চোখ কিন্তু মনের।এই চোখ দিয়ে তুই খুব গরম কোনো দুপুরে কল্পনা করতেই পারিস বসে আছিস ফুরফুরে কোনো পুকুরপারে!ভিড় বাসে মুরগীবাচ্চার কঁককঁকানি আর মেছো আঁশটে গন্ধে মনটাকে বিরক্ত হতে না দিয়ে তুই দেখতেই পারিস তোর ঠাকুর্দার দেশ এরোয়ালী গ্রামের বড়কালী বিসর্জনের বাজীপোড়ানো রাত।যা চোখ দিয়ে দেখছিস সেটাই কিন্তু শুধু দেখা নয় রে, মনটা দিয়ে চোখের দেখাটাকে বদলে দিতে পারলেই দেখবি খুশীতে ভরে গেছে দুঃখের দুপুরগুলো। বাপন আমি এরপর আর চিঠি লিখতে পারবোনা।ডাক্তার সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে।বলে, আপনার শরীরের কষ্ট হচ্ছে।বিশ্রাম দরকার।কি বোকা এরা বুঝলি!এরা সারাদিন খুব ব্যস্ত আমায় নিয়ে।কিন্তু এরা বোঝেনা আমি না দেখতে পেলে আর লিখতে না পেলেই তাড়াতাড়ি চলে যাবো।ভাগ্যিস মনের চোখ দুটো ছিলো।এই চিঠিটাই তোকে লেখা আমার শেষ চিঠি রে।কেন? সেটা বুঝবি কিছুদিন পরেই। না এটা তোকে আমি বোঝাবোনা।এটা তোকে নিজেই বুঝতে হবে।তুই তো এখন সদ্য কৈশোরে হাঁটি হাঁটি পা...কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখবি মোলায়েম মোচ পেরোনো বেয়ারা বয়েসেও তোকে সমান

ভাবাচ্ছে।আমি জানি আমি অনেক শক্ত শক্ত কথা বলছি,কিন্তু এসে যাচ্ছে রে।আসলে মনে হচ্ছে ওরা জোর করে আমার একটা চোখ কেড়ে নেবে একটু পড়ে।আমি ... আর আমার বুকের রক্তগুলোদিয়ে শব্দ গড়তে পারবোনা এই জীবনে।খুব কষ্ট হচ্ছে রে।মনে পড়ছে সেই ছেলেবেলার কথা।জাপানী বোমার ভয়ে জমিদার বাড়ীর পাশের আগছা জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে বাঙ্কারে লুকিয়ে থাকার দিনগুলো।সাইরেন বাজলেই দুরদার করে সব্বাই মাটির নীচে।তারপর একদিন আমাকে চলে যেতে হলো আমার মামা বাড়ীর দেশে।পদ্মাপাড়ের হরিতকীপুরে নদীর দুলকি চালে পৌঁছে গেলাম একদিন।সার সার টিনের চালে ছড়ানো বিশাল এলাকা জুড়ে আমার মামার বাড়ী।বড় মামা ষ্টীমার ঘাটের এজেন্ট।যখন তখন ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান... আর ভটভটিতে মাঝি মাল্লাদের রান্না করা হাঁসের কষা মাংসের স্বাদ।

সেই একমাস যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।বাড়তি একটু খুশী।তারপরে হঠাত আবার এদেশ, সেই জমিদার বাড়ী,সেই পূজামন্ডপের চাতাল।সবকিছু সেই...সেই...সেই।আবার ওরা কেড়ে নিলো আমার আনন্দটা।এখনো আমার সেরকম মনে হচ্ছে জানিস।আগেকার দিনগুলো বড্ড মনে হচ্ছে।আর ভয়ও হচ্ছে মনের চোখটা চলে যাবে নাতো?বিষাক্ত ঘাগুলো হিস হিস করে নীলচে ফনা শাঁসাচ্ছে মনের ওপরেও। ছোবল বসাতে কতক্ষন? আমার প্রিয় বাপন।আমি জানিনা,তোর সাথে এজীবনে আর দেখা হবে কিনা। সত্যিই জানিনা।কিন্তু পূজো আসছে।টিভিতে ঢ্যাম কুড়াকুড় সারাক্ষন।শচীন কর্তা আর মানবেন্দ্রর বিখ্যাত গানগুলো আবার কে সব গেয়েছে দেখি।এবাড়ীতে টিভির লোকদেখানো আনন্দ আমাকে খুশী রেখে বাকীদের শাড়ীর আঁচলের আড়ালে চোখের জলের শব্দ ঢাকার জন্য।আমি সব জানি রে।বলি না এদের।কষ্ট হয় আমার।তোকেই বলি সব।বললাম এসব...শেষবারের মতো।ভালো থাকিস।মানুষের মতো মানুষ হোস।ডাকব্যাকের ব্যাগে মোড়া সিলেবাসের দিনগুলোর চেয়ে অন্য সিলেবাসের ভালো মানুষ হওয়া অনেক ইম্পর্ট্যান্ট রে।বুঝিস এটা সারা জীবন ধরে।এপর্যন্তই থাক... বাকি জীবনের মতো।খুব শিগগিরি চললাম।আবার কখনো পরে দেখা হলে চিনতে পারবিতো?আমি কিন্তু তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।

তোর দাদুভাই

অতনু ব্যানার্জী
কলকাতা

বিদেশী রূপকথা: দাঁড়কাক

সে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। এক দেশে ছিল এক রানি আর রানির ছিল একটা ছোট্ট মেয়ে। সে এতটাই ছোট ছিল যে তাকে সবসময় কোলে কোলে নিয়ে রানিকে ঘুরে বেড়াতে হত। কারন সে যে খুব ছোট্ট ছিল আর রোগাও ছিল। তবে ছোট্ট হলে হবে কি মেয়েটা ছিল ভীষন ছটফটে আর দুষ্টু। তাকে খাওয়াতে ঘুম পাড়াতে আর তার কান্না থামাতে রানির ঝামেলার অন্ত নেই। একদিন রানি এমনি করেই কোলে করে মেয়েকে নিয়ে তার দুষ্টুমি থামানোর জন্য রাজমহলের বারান্দায় পায়চারি করছেন কিন্তু মেয়েতো কিছুতেই কথা শোনেনা, কান্না থামায় না। রাজমহলের পাশ দিয়ে তখন উড়ে যাচ্ছিল অনেকগুলো দাঁড়কাক আর রানি তো তখন মেয়ের দুষ্টুমিতে রেগে আগুন, তাই জানলা খুলেই দাঁড়কাকের দিকে তাকিয়ে মেয়েকে বলল তুই যেন এমনি দাঁড়কাক হয়ে উড়ে যাস অনেক দূরে তাহলেই আমি খানিকক্ষন বিশ্রাম পাব। কিন্তু রানির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তার মাথার ওপর ঝটপট শব্দ করে মেয়েটা দাঁড়কাক হয়ে উড়ে গেল অনেক অনেক দূরে এক অন্ধকার বনের ভেতর। সেদিন থেকে রানির মেয়ের আর কোন খবর নেই- সে দাঁড়কাক হয়েই রইল আর রানির বুকে জমে রইল দুঃখের পাহাড়।

তারপর অনেকদিন পর একজন লোক সেই অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেল দূরে কোথাও একটা দাঁড়কাক কাঁদছে। কাকের কান্নার শব্দ অনুসরন করে করে লোকটা দাঁড়কাকের কাছে পৌঁছতেই, দাঁড়কাক বলে উঠল বন্ধু, আমাকে তুমি সাহায্য কর। আমি এক রানির মেয়ে, কিন্তু এখানে জাদুবলে আমি বহুদিন দাঁড়কাক হয়ে আছি;

তুমি আমাকে উদ্ধার করে সাহায্য করবে?

এই কথা শুনেই লোকটা জিজ্ঞেস করল সে কিভাবে তাকে এই জাদুরুপ থেকে আবার পুরোনো রুপে যেতে সাহায্য করতে পারে?

দাঁড়কাক বলল, বন্ধু শোনো, তোমাকে কি করতে হবে- এখান থেকে আরও কিছু দূর গভীর বনের দিকে গেলেই তুমি দেখতে পাবে একটা পুরোনো বাড়ী, সেখানে এক বুড়ি বসে রয়েছে- সে তোমাকে খাবার আর জল দেবার জন্য ডাকবে, কিন্তু তুমি ওইসব খবরদার ছুঁওনা কারন তাহলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। বাড়ীর পেছনে যে বাগান আছে সেখানে দেখবে চামড়ার বিশাল এক স্তুপ, সেখানেই তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। আগামী তিন দিন ধরে প্রতি দুপুরেই ঠিক দুটোর সময় আমি ঘোড়া গাড়ী করে আসব সেখানেই।প্রথম দিন আমি সাদা ঘোড়া করে,

দ্বিতীয় দিন খয়েরী ঘোড়া করে আর শেষের দিন আমি আসব কালো রঙের ঘোড়া টানা গাড়ি করে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু আমি মুক্ত হতে পারব না। এই কথা শুনে লোকটা দাঁড়কাককে আশ্বস্ত করল যে, সে ঘুমিয়ে পড়বে না, আর দাঁড়কাকও মানে রানির সেই মেয়ে আরও একবার তাকে মনে করিয়ে দিল যে সেই বুড়ির কাছ থেকে সে যেন জল খাবার কিচ্ছুটি না খায় কারন বুড়ির হাত থেকে কিছু খেলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

দাঁড়কাকের কথা শুনে লোকটা এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে; গিয়ে দেখল ঠিক যেমনটি বলেছিল দাঁড়কাল ঠিক তেমনই এক বুড়ি বসে রয়েছে বাড়ীর দাওয়ায়। দেখা মাত্রই বুড়ি তার কাছে এগিয়ে এল, তাকে দেখেই বলল তুমিতো বাবা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছো, অনেক দূর থেকে আসছ বুঝি? এসো কিছু খাবার আর জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও। কিন্তু লোকটা তো দাঁড়কাককে কথা দিয়েছে তাই সাথে সাথেই সে না বলে দিল। কিন্তু বুড়িও তো নাছোড়বান্দা, তাই তাকে বলল খাবার না খাও এক গ্লাস জল অনন্ত খাও বাবা, তাহলে কিছুটা হলেও একটু স্বস্তি পাবে। লোকটাও এতোটা দূরে হেঁটে আসার ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, দাঁড়কাকের কথা ভুলে গিয়ে সেও জল খেয়ে নিল। দুপুর দুটোর কিছু আগেই দাঁড়কাকের কথা মতো সে বাড়ীর পেছনের বাগানে যেখানে চামড়ার বিশাল স্তুপ ছিল সেখানে হাজির হল আর দাঁড়কাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু, কিছুক্ষন পরেই লোকটার চোখ লাল হতে হতে ঘুমে ঢলে এল, সে নিজেকে হাজার চেষ্টা করল চোখ বড় করে করে জেগে থাকার কিন্তু কোন কিছুই কাজে লাগল না। কিছুক্ষনের মধ্যেই সে এমন ঘুমে চলে গেল যে বাইরের কোন শব্দই আর তার কানে গিয়ে পৌঁছনার মতো অবস্থা রইল না।

এদিকে দাঁড়কাক তো ঠিক দুটোতে তার কথা মতো সাদা ঘোড়া টানা গাড়িতে করে এসে হাজির। এসেই ঠিক যা ভেবেছিল, তাই দেখে ভীষন দুঃখ পেল, বারে বারে বলে দেওয়া স্বত্বেও তার কথা না শুনে লোকটা সেই ঘুমিয়েই পড়ল। দাঁড়কাক আর কি করে, মনের কষ্টে সে ফিরে গেল সেদিনের মত।

পরেরদিন লোকটা ঠিক করল তাকে যতই বলা হোক না কেন সে কিচ্ছুটি মুখে তুলবে না এমনকি এক ফোঁটা জল পর্যন্ত সে গ্রহন করবে না। কিন্তু বুড়ি তো নাছোড়বান্দা আর শেষপর্যন্ত বুড়ির এই জোড়াজুড়িতে হেরে গিয়ে লোকটা আগের দিনের মতই সেদিনও এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলল। আর দুপুর দুটোর আগে বাগানের ভেতর চামড়ার স্তুপ এর ওপর অপেক্ষা করতে করতে আগের দিনের মতই গভীর ঘুমে চলে গেল। এমনিই রাজকন্যা দুঃখে ছিল গতদিনের কারনে, তার ওপর আজকেও এসে সে দেখল লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। খয়েরী রঙের ঘোড়াদের থেকে নেমে এসে সে লোকটাকে অনেক ডাকাডাকি করে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু সে এতটাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে কোন শব্দই তার কানে গিয়ে পৌঁছলোনা আর রাজকন্যেও মনের দুঃখে সেদিনের মত ফিরে গেল।

তৃতীয় দিন লোকটা মনে মনে ঠিক করল আজ যে করেই হোক রাজকন্যার কথা রাখতেই হবে আর আজ সে সত্যিই এক দানা খাবার তো দূর অস্ত, এক ফোঁটা জলও সে স্পর্শ করবেনা। তাই দেখে বুড়ি তাকে বলল, তুমি কি ভেবেছ? না খেয়ে মরে যাবে? লোকটা এই কথা শুনে বলল যে সে কথা দিয়েছে কাউকে তাই খাবার আর জল কিছুই গ্রহন করতে পারবেনা আর সে চায়ও না তার দেওয়া কথা থেকে সরে আসতে। কিন্তু কিছু পরেই বুড়ি একটা বড় থালায় করে কিছু ফল আর এক গ্লাস আঙ্গুরের রস তার সামনে আনতেই ফলের গন্ধে তার ভেতরটা আনচান করে উঠল আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে সমস্ত কিছুই আগের দিনের মত খেয়ে ফেলল। দুপুর দুটোর একটু আগেই সে

বাগানের দিকে রওনা হল কিন্তু যেতে না যেতেই ঘুমে ডুবে গেল আর পাথরের মত নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল চামড়ার স্তুপের ওপর। সেদিনও দুটোর সময় রাজকন্যে এল চারটে কালো রঙের ঘোড়ায় টানা কালো রঙের গাড়ীতে করে চড়ে। গাড়ী ঘোড়া সব কিছুর রঙই কালো ; গত দুদিনের ঘটনায় রাজকন্যা এমনিতেই খুব দুঃখে ছিল তাই আসতে আসতেই সে মনে মনে ভাবছিল –লোকটা তাকে যে উদ্ধার করতে পারবে না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে গেছে। সেদিনও রাজকন্যা দেখল লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে যথারীতি। ঘোড়া থেকে নেমে রাজকন্যা তার পাশে একটা পাউরুটির টুকরো,একটা মাংসের টুকরো আর এক বোতল আঙুরের রস রেখে দিয়ে মনে মনে জাদুবলে প্রার্থনা করল লোকটার যেন এ জিনিসগুলোর কোনদিনও অভাব না হয়। তারপর তার হাতের একটা সোনার আংটি খুলে লোকটার হাতে পড়িয়ে সেখানে রাজকন্যের নাম খোদাই করে দিল। বাগান থেকে ফিরে যাওয়ার আগে রাজকন্যে সাদা একটুকরো কাগজে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে লোকটার পাশে দিয়ে গেল।চিঠিতে তাকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি এবং উদ্ধার করতে না পেরে লোকটার ঘুমিয়ে পড়া সবকিছুরই কথা রাজকন্যা লিখে দিল আর তার সাথে এও লিখলো যে লোকটা যদি এরপরও সত্যিই রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চায় তাহলে সে যেন রত্নাগড়ের দূর্গে যায়, রাজকন্যাকে সেখানেই সে পাবে। চিঠিটা লোকটার পাশে রেখেই রাজকন্যা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে রত্নাগড়ের দূর্গের দিকে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে, ঘুম ভাঙতেই পুরো ঘটনার কথা মনে করে আর রাজকন্যাকে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি না রক্ষা করতে পারার কথা ভেবে লোকটার তো দুঃখের অন্ত নেই, লজ্জায় তার নিজের প্রতিই নিজের রাগ হতে থাকলো। সে মূর্হুতেই লোকটা ঠিক করলো সে রত্নাগড়ের দুর্গে যাবেই আর রাজকন্যাকে উদ্ধারও করে আনবে। কিন্তু রত্নাগড়ের দূর্গ কোথায়? কে তাকে বলে দেবে সে পথ? এসব ভেবে ভেবে কুলকিনারা করতে না পেরে সে নিজেই গভীর বনের দিকে রওনা দিল। চোদ্দ দিন ধরে একটানা বনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত খুঁজেও যখন সে রত্নাগড়ের দূর্গ খুঁজে পেলনা তখন বনের একপ্রান্তে নরম ঘাসের ওপর এসে ক্লান্ত শরীরে সে শুয়ে পড়ল। এতোটা রাস্তা চলার পর সেও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই সাথেই সাথেই তার চোখ বুঝে এল। কখন যে চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তার খেয়ালই নেই। হঠাৎই

চারপাশ থেকে হালকা কান্না আর চিৎকারের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। লোকটা তাকিয়ে দেখল তার দিকেই আলোর এক সরু রেখা এগিয়ে আসছে। আলোর দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল দূরে কোন এক ছোট্ট বাড়ী থেকেই সে আলো আসছে। আলো ধরে ধরে লোকটা এগোতে এগোতে একসময় সে বাড়ীর সামনে এসে হাজির হল। সামনে এসেই দেখতে পেল ছোট বাড়ীটার সামনে এক বিশাল বড় দৈত্য পাহারায় রয়েছে। দৈত্যকে দেখেই ভয় পেয়ে গেলেও মনে মনে লোকটা ভাবল, যদি তাকে দেখতে পেয়ে যায় দৈত্য তাহলে সে মূর্হুতেই তার প্রান চলে যাবে কিন্তু তাও অনেক ভেবে লোকটা এগিয়ে গেল বাড়ীটার দিকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই দৈত্যও লোকটাকে দেখতে পেয়ে বলল– খুব ভালো করেছো তুমি এসেছো। অনেকক্ষন ধরেই আমি কিছু খাইনি, তাই এই খিদের মুখে তোমাকেই আমি খাবার হিসেবে আজ গ্রহন করব। কিন্তু লোকটা একটুও ভয় পেলনা। সাহসের সাথে সে বলল– দেখ, দৈত্যভাই, তুমি আমাকে খেলে শুধু আমাকেই পাবে আর তাতে তোমার পেটও বিশেষ ভরবে না কিন্তু আমার কাছে সে উপায় আছে যাতে তোমাকে অঢেল খাবারের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। দৈত্যতো এ শুনে আহ্লাদে আটখানা। লোকটাকে ডেকে খাবার টেবিল এ নিয়ে এল দৈত্য। আর লোকটার কাছেও তো রাজকন্যের দেওয়া বর ছিল।তাই সে যতখুশী পাউরুটি, মাংস আর আঙুরের রস এনে দিল দৈত্যকে। পেট পুরে খেয়ে দৈত্যর আনন্দ দেখে কে! সে বলল বলো, তোমার জন্য কি করতে পারি? লোকটা দৈত্যকে রত্নাগড় দূর্গের রাস্তা চিনিয়ে দিতে বলল। দৈত্য তার ঘর থেকে পুরোনো নকশা এনে তাকে দূর্গের রাস্তা দেখিয়ে দিল। দূর্গ পাশের রাজ্যে ছিল, তাও নয় নয় করে প্রায় একশো মাইল দূরে তো হবেই। লোকটার তো মাথায় হাত। এত দূর রাস্তা সে কি করে পায়ে হেঁটে যাবে! তার বিপদের কথা সবিস্তারে খুলে বলাতে দৈত্য বলল, তার কাছে মাত্র দু ঘন্টা সময় আছে, এই সময়ে সে কাঁধে করে তাকে যতদূর পৌঁছে দিতে পারবে দিয়ে আসবে কারন ফিরে এসে তাকে তার ছেলেকে খাওয়াতে হবে। লোকটাও রাজি। যেমন বলা তেমনি কাজ– পিঠে করে দৈত্য লোকটাকে প্রতিবেশী রাজ্যে নিয়ে চলল আর রত্নাগড় দুর্গের কিছু দূর পর্যন্ত দিয়ে এসে দৈত্য বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

কাছাকাছি আসতেই লোকটা দেখতে পেল দূর্গটা পুরোটা একটা কাঁচের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সব জাদু প্রহরীরা দুর্গের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে; তাদের চোখ এড়িয়ে দুর্গের কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল অনেক ওপরে রাজকন্যা দাঁড়কাকের রুপে পাহাড়ের ওপর বসে রয়েছে। তাকে দেখেই লোকটার প্রানে খুশীর জোয়ার এল আর সে কাঁচের পাহাড় বেয়ে দাঁড়কাকের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে থাকল; কিন্তু পাহাড়তো কাঁচের তাই যত সে ওপরে উঠতে চায় ততই সে পা হড়কে নিচে চলে আসে; এমন করে কেটে গেল দিন কেটে গেল রাত কেটে গেল বছর– কিন্তু লোকটা মনস্থির করে ফেলেছে রাজকন্যা কে উদ্ধার না করে সে বাড়ী ফিরবে না। তাই পাহাড়ের নিচে সে তার নিজের একটা থাকার ঘরও বানিয়ে ফেলল আর সেখান থেকেই রোজ সে একবার করে পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা করে আর দেখে তার মাথার ওপর দাঁড়কাকের রুপ নিয়ে পাহাড়ের ওপর রাজকন্যা ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায় আর দুপুর হলেই দুর্গের ভেতর ঢুকে যায়। দুঃখ হলেও সে এবার হাল ছাড়বে না ঠিক করেছে।

একদিন সে তার তার ঘর থেকে দেখতে পেল তিনজন চোর নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করছে কি একটা জিনিস নিয়ে। খানিকক্ষন দেখার পরও যখন সে দেখলো তাদের ঝগড়া থামছে না তখন মনস্থির করল সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা একটু দেখে আসা দরকার। কাছে আসতেই সে জানতে পারল তাদের ঝগড়ার আসল কারন। প্রথম চোর বললো সে একটা জাদুকাঠি পেয়েছে যা দিয়ে ছুঁলে পৃথিবীর সব বন্ধ দরজাই খুলে যাবে, দ্বিতীয় চোর বললো সে একটা জামা পেয়েছে যা পরলে সবার চোখ থেকে

অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যাবে আর তৃতীয় চোর বলল সে একটা ঘোড়া পেয়েছে যাতে যেখানে খুশি অনায়াসে যাওয়া যাবে এমনকি কাঁচের পাহাড়েও পৌঁছোনো যাবে। তারা ঠিক করতে পারছে না কোনটা কে নেবে, নাকি তারা তিনজনে ভাগাভাগি করে নেবে সব জিনিসগুলো!

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল আমি এর একটা সহজ উপায় বের করে দিতে পারি তোমাদের-তোমরা তোমাদের তিনটে জিনিসই আমাকে দিয়ে দাও আমি এর বদলে তোমাদের আরও মূল্যবান জিনিস দেব। সেটা হয়ত অর্থ নয় কিন্তু অর্থের থেকেও মূল্যবান। কিন্তু, তার জন্য আমাকে আগে পরীক্ষা করে দেখাতে হবে তোমরা যা বলছ তা সবই সত্যি। তখনই তৃতীয় চোর তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে বলল দেখো, এ ঘোড়া তোমায় সত্যি যেকোনো জায়গায় নিয়ে যায় কিনা আর বাকি দুই চোরও তার হাতে জামা আর জাদুকাটি দিয়ে দিল পরীক্ষা করার জন্য। জাদুকাঠি পাওয়ার সাথে সাথেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর ঘোড়া ছুটিয়ে কাঁচের পাহাড় বেয়ে রত্নাগড় দূর্গের দিয়ে উঠতে লাগল। লোকটাকে দেখতে না পেয়ে আর ঠকে গেছে বুঝতে পেরে চোর তিনটে তো ততক্ষনে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেছে।

এদিকে দুর্গের সামনে আসতেই লোকটা দেখল দুর্গের দরজা ততক্ষনে বন্ধ হয়ে গেছে, সে জাদুকাঠি ছোঁওয়াতেই দরজা খুলে গেল আর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।সেখানেই সে দেখতে পেল রাজকন্যা একটা বড় পাত্রে আঙুরের রস নিয়ে বসে রয়েছে মনকেমন করে। সাথে সাথেই তার হাতের আংটি রাজকন্যার সামনে রাখা পাত্রে সে ফেলে দিতেই শব্দ করে উঠল। রাজকন্যা আংটি হাতে নিয়েই তার নাম লেখা দেখে বুঝতে পারল যে সেই মানুষটা এসে গেছে যে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। আর তাকে দাঁড়কাক হয়ে বাইরে উড়ে উড়ে বেড়াতে হবে না। রাজকন্যাতো লোকটাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, সে যে জাদু জামা পড়ে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। চারিদিকে তাকাতে লাগল রাজকন্যা, আর লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে রাজকন্যাকে কোলে তুলে ঘোড়ায় চেপে বসল, তারপর ঘোড়া চালিয়ে সোজা দুর্গের বাইরে। দুর্গের সবাই ছুটে এসে রাজকন্যাকে খুঁজতে লাগল কিন্তু তারা তাকে পাবে কি করে? লোকটা তো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে চলে এসেছে ততক্ষনে।

রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এলে রাজা আর রানির আনন্দ দেখে কে! তারা তো আনন্দে কেঁদেই ফেললেন আর রাজকন্যা?

সে আর কি করবে?- লোকটার বাঁদিকের গালে ঠোঁট বুলিয়ে বলল তুমি আমায় উদ্ধার করেছো। তুমিই আমার বর। তারপর ধুমধাম করে রাজকন্যার সাথে লোকটার বিয়ে দিলেন রানিমা আর তারপর থেকে তারা পরমসুখে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

(জার্মানীর রূপকথা অবলম্বনে)

রমিত দে
কলকাতা

পড়ে পাওয়া: নীলমণিয়া

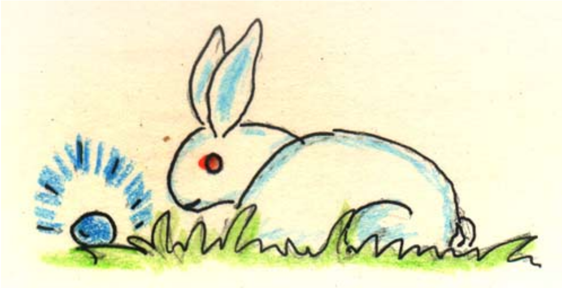

এক যে ছিল গভীর বন। বনের মধ্যে এক গর্ত। গর্তের মধ্যে থাকে এক খরগোশ, আর তার ছটফটে বউ। খরগোশনি এদিক সেদিক লাফিয়ে বেড়ায়। খরগোশ বড্ড কুঁড়ে, গর্ত ছেড়ে নড়ে না। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে।

লাফাতে লাফাতে খরগোশনি বেশ দূড়ে গিয়ে পড়েছে। কী করে, সে তাড়াতাড়ি এক মস্ত অশথ গাছের তলায় একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। ফুলো লোম ভিজে যাবে যে! এই গর্তে ঢুকে খরগোশনি দেখে, চমতকার একটা নীল রঙের পাথর থেকে আলোর ছটা বেরিয়ে গর্তটাকে স্বপ্নের মত করে রেখেছে। খরগোশনি তো অবাক। বৃষ্টি থামতে সে পাথরটাকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল, খরগোশকে দেখাতে।

সেই গর্তটা আসলে ছিল এক শঙ্খিনী সর্পকুমারীর। ওটা তারই মাথার মণি। সাপের মাথার মণির গুণ হল, তার সামনে মনে মনে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে। সর্পকুমারী তার মণিটা খুলে গর্তে রেখে দিয়ে মানুষী সেজে শহরে বেড়াতে যেত। সেদিন বাড়ি এসে আর মণি খুঁজে পায় না। ও- কি? কে নিলে?কী হল? খোঁজে, খোঁজে, পায় না! শেষকালে অশথ গাছের নীচে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। এমন সময় সেখান নিয়ে এক নেউল যাচ্ছিল। নেউল বললে,' কে গো মেয়ে তুমি? কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? এই গহন বনে তুমি কী করছ?'

সর্পকুমারী তো আর নেউলকে বলতে পারে না যে সে আসলে শঙ্খিনী সাপ? সাপে-নেউলে জন্ম জন্মান্তরের শত্রুতা কিনা। সর্পকুমারী বললে -' আমি রাজকন্যে- বনের ওপারে থাকি। খেলতে খেলতে এখানে এসে পড়েছি- আমার সুন্দর নীলমণি পাথরটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছি না, তাই কাঁদছি।' নেউল বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি খুঁজে দিই, তুমি কি তাহলে আমাকে বিয়ে করবে? আগে কথা দাও?' সর্পকুমারী তখন মণির শোকে কাতর, বল্লে,'হ্যাঁ, নিশ্চয় বিয়ে করব, কথা দিলাম।'

সর্পকুমারী কি সত্যি বিয়ে করল নেউলকে? তারপরে কি হল? জানতে হলে পড়ে ফেলতে হবে 'নীলমণিয়া'। এরকম আরো সুন্দর অনেক রূপকথার গল্প নিয়ে নবনীতা দেবসেন এর একগুচ্ছ সঙ্কলন 'ইচ্ছামতী' নামের বইতে পড়তে পারবে এই গল্পটা।

ইচ্ছামতী
নবনীতা দেবসেন
আনন্দ
১২৫ টাকা

[পুরাণকথা: কুনগুত্যের পুরান ঝুলি]

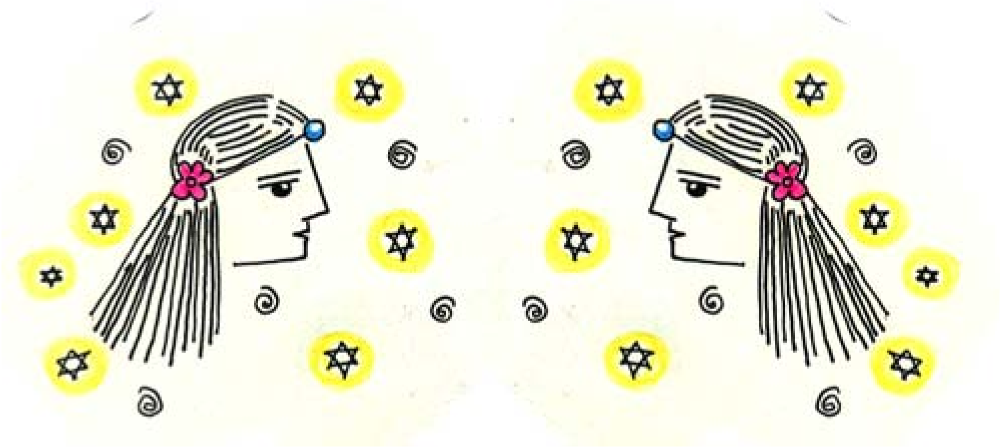

"সে তো অনেক অনেক কাল আগের কথা!
ব্রহ্মান্ডের কোনো কোণেই মানুষের পায়ের ছাপ তখনো পড়ে নি।
না ছিলো স্বর্গ,না ছিলো কমলালেবু আকারের পৃথিবী!"
মিটিমিটি হাসছে বুড়ি কুনগ্যুত্যে।

সন্ধ্যের রং বদলানো আকাশটার দিকে এক ঝলক অন্যমনস্ক চোখ বুলিয়ে পাতলা চাদরে গুটিসুটি মেরে গল্পে ফিরেছে বুড়ি,

"শোন্ তবে........"

সুন্দরী দেবী মাগোর প্রিয় বান্ধবী উল্লাও যেমন সাদাসিধে তেমনি পরোপকারী।মিষ্টি ব্যবহার আর ভালো কাজের সুবাদে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেবী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।আহা তখন কেই বা জানতো সে সুখ হারিয়ে যাবে চিরতরে!

'দেবতারা অমর'কথাটা বহুবার শোনা।কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভুরি ভুরি অন্যায় করলেও ওঁদের মোটে সাজা পাবার ভয় নেই।অথবা বিধাতাপুরুষ কিচ্ছুটি বলবেন না।বরং অতি সামান্য একটা দোষ মাফ করা তো যোজন দূরের কল্পনা,বেচারি উল্লাওকে নিজের জীবনটাই খোয়াতে হলো!

সখীর অকালমৃত্যুতে বড্ড আঘাত পেলো মাগো।একা একা সময় যেন কাটতেই চায় না।উল্লাওর পুতুলগুলো বুকে জড়িয়ে চুপটি করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই ইচ্ছে হলো,"ইস্ যদি দুটো জ্যান্ত পুতুল পেতাম,কী মজাটাই না হতো।"যেই না ভাবা,অমনি দুটি ফুটফুটে মেয়ে কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর কোলে।মাগো তো মহা খুশী।আদর করে দুই মেয়ের নাম রাখলেন গুন্গে ও সহে।
কথায় বলে না, সময়ের পা অনেক লম্বা।তাই দৌড়তে পারে সবচেয়ে জোরে।বিশেষ করে যেখানে একবার চোখের পলক ফেললেই দেবতাদের বছর ঘুরে যায়,তেমন জায়গায় ছুটেও সুখ!
দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে কিশোরী গুন্গে সহে।একসময় ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেন মা মাগো।কিছুদিন যেতে না যেতেই গুন্গে দুটি পুত্র,সহে দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়।এই চারটি শিশুই স্বর্গের মাটিতে জাত প্রথম মানবসন্ততি।তবে এঁরা ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়,বলা যেতে পারে মহামানব।

এদিকে বিস্তর পুণ্যবলে পুনর্জন্ম লাভ করে উল্লাও।তাঁর পবিত্র শরীর থেকে ক্রমে তৈরী হয় স্বর্গ মর্ত্য মহাসাগর এবং সেই সঙ্গেই আগুন জল মাটি ও আত্মা।শেষ চারটি উপাদান মিলে সৃষ্টি হয় প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত।

জগৎ না হয় গড়া হলো।এবার সমস্যা হচ্ছে এতো বিশাল জায়গা দেখাশোনার ঝক্কি কে সামলাবে?চিন্তায় চিন্তায় ওজন অব্দি কমে গেলো দেবতাদের।যাইহোক মুহুর্মুহু টেবিল চাপড়ে,অগুন্তি ভাঁড় ডাবের জল গলায় চালান করে শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো গুন্গে ও সহের কৃতী ছেলেপুলেদের দেওয়া হোক এই কাজের ভার।

পৃথিবী যে এমন অপরূপা স্বপ্নেও ভাবে নি কেউ।হেথায় গাঢ় নীল সাগরের অচেনা হাতছানি,তো হোথায় চোখ জুড়ানো সবুজ মাঠে হাওয়ার কানামাছি খেলা।কোথাও ধূসর পাহাড়ের মাথায় রামধনুরঙা বরফের মুকুট,তো অন্যখানে চঞ্চল সোনালী বালির শরীরে একমুঠো রোদের নামতা!উল্লাও ঠাকুমাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো সকলে।কারণ সমস্তটা যে তাঁরই রচনা!নাতিপুতিরা পছন্দমত জীবনসঙ্গী খুঁজে বিয়ে করেছে,খবর পেলেন মাগো।আবার ঘর ভরে উঠলো কচিকাচাদের মিঠে কলতানে।এইরূপে ধীরে ধীরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে লাগলো!

সেই যুগে প্রাণীদের দাঁত ছিলো না।ধরিত্রী মায়ের বুকের দুধই জোগাত তাদের খাবার।পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা ঝরনাগুলো ছিলো সেই সুস্বাদু দুধের উত্স।অথচ এতগুলো পেট ভরানোর মত যথেষ্ট পানীয় কোথায়?দেখা গেলো ঘন্টার পর ঘন্টা সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করেও বহুজনকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে।দিনের পর দিন খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে জিসো নামের এক যুবক একদিন খেয়ে ফেললো টসটসে কয়েক ছড়া আঙ্গুর!ফলগুলো জিভের স্পর্শে আসতেই সে চমকে ওঠে!আরে এ যে এক অদ্ভুত মনকাড়া স্বাদ!এমন আজব অভিজ্ঞতা বাকি সঙ্গী সাথীদের কানে না তুলে কী পারা যায়?ছুট্টে গিয়ে জানালো যাকেই সামনে পেলো।জিসোর কাছে বর্ণনা শুনে সেদিন যারা মুখে দিয়েছিলো সেই লোভনীয় আঙ্গুর,দেখা গেলো সাত দিনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে তাদের প্রত্যেকের দাঁত গজাতে আরম্ভ করেছে!তা দাঁত থাকতে কে আর শুধু দুধে সন্তুষ্ট থাকবে?এবার আর গিলে নয়,সব খাবার চিবিয়ে খেতে সাধ হলো।ব্যাস,সেই থেকে চালু গাছের ফল ও পশু শিকার করে পেটপুজো।

এতোদিন চোখ থাকলেও দৃষ্টি ছিলো না।কিনতু খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে চোখে দেখতে পাওয়া জরুরী। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে অবতারমানুষ লাভ করলো দর্শনশক্তি।হাত পা আগের চেয়ে ভারী হয়ে গেলো।গায়ের

চামড়ার মসৃণতা কমে এলো।শিখলো মুখে শব্দ করতে।তবে হারিয়ে ফেললো বিশেষ শ্রবণক্ষমতা,যা তাদের ঈশ্বরের বানী শুনতে সাহায্য করেছিলো। এই প্রকারে তিলে তিলে আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা রূপান্তরিত হয় আজকের মানুষে।

আট বছরের কিম এতক্ষণ প্রায় গোগ্রাসে গিলেছে শুরু থেকে শেষ।এবার মনের সামান্য সন্দেহটুকু উগরে না দিয়ে পারল না!

"গল্পটা সত্যি দিদিমা?"

নাতির ঘন চুলে কাঁপা হাতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে কী যেন চিন্তা করলো কুন্গুত্যো।সত্যিই কি কেউ জানে পৃথিবী আর মানুষের জন্মরহস্য? হয়তো না।তবে কোরিয়া দেশের ঘরে ঘরে সব বাচ্চা এই গল্প শুনেই তাদের শৈশব পার হয়।

শর্মিষ্ঠা খাঁ
দক্ষিণ কোরিয়া

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ১

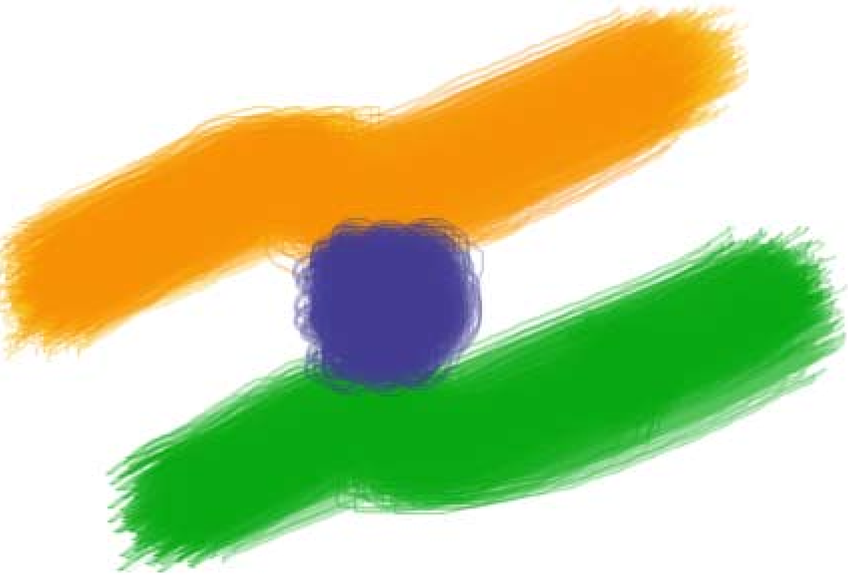

পূজো এসে গেল, মানে পূজোর ছুটি-ও এসে গেল। নতুন জামা-কাপড় পরে বড়দের সঙ্গে ঠাকুর দেখা, কত্তো রকমের খাবার খাওয়া, বন্দুক নিয়ে টিভি-র সুপার হিরো হয়ে যাওয়া – এত কাজের মধ্যে কি আর আমার গল্প শুনতে ভাল লাগবে? তুমি পড়াশোনা কর নম্বর পাওয়ার জন্য। আমি কিন্তু লিখি তোমার মন ভাল থাকবে বলে। এর সঙ্গে ভাল-খারাপ, পাশ-ফেল এসবের কোন সম্পর্ক নেই।এই সংখ্যা থেকে আমি তোমাকে একটা বিরাট বড় গল্প বলতে শুরু করলাম। এই গল্প আমাদের দেশের সুপার-হিরোদের নিয়ে,যাঁরা আমাদের এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা, উতসর্গ করেছেন নিজেদের প্রাণ। এখন আমরা তো স্বাধীন হয়ে গিয়েছি, তাই ঠিক বুঝব না কাজটা কত কঠিন ছিল। তোমার ঐ গল্পের সুপার-হিরোরাও হার মেনে যাবে, এঁদের সত্যিকারের গল্পের কাছে।

তুমি তো জান যে, ইংরেজরা আমাদের দেশকে প্রায় দু'শো বছরের ও একটু বেশিদিন শাসন করেছেন বটে, কিন্তু, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব তাঁরা করতে পারেন নি।

তখন ১৬০০ সাল। ইংল্যান্ডের রানী তখন এলিজাবেথ। পৃথিবীর খুব পরাক্রমী, শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে একটা ছিল ইংল্যান্ড। ব্যবসায়ীক পরিধি বাড়ানোর জন্য রাণী নিজে এক বাণিজ্যিক সংস্থাকে প্রাচ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দেন। সেই সুবাদে 'ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি' নাম হয় তার। ইউরোপে বিরাট তার ব্যবসা, বিশাল তার প্রতিপত্তি।

ভারতে দিল্লির সিংহাসনে তখন আউরঙ্গজেবের দাদু জাহাঙ্গীর। সাল ১৬০৮। ততদিনে ইংল্যান্ডের মসনদে রাজা প্রথম জেমস। ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আসেন।তাতে খুব একটা কাজ হয় না।কিন্তু কোম্পানি হাল ছাড়ে নি। আবার ১৬১৫ সালে স্যর টমাস রো -কে আবার সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে পাঠায় কোম্পানি।এবার কোম্পানির ভারতে আসার বানিজ্যিক উদ্দেশ্য সফল হয়।

শুনলে অবাক হবে যে তখন বঙ্গদেশ বিদেশী দের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। কলকাতার খুব কাছ দিয়ে

একটা নদী বয়ে গেছে। সরস্বতী তার নাম। তবে এখন যে কোনো সাধারণ সরু খাল-ও তার থেকে চওড়া। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কোম্পানির বিরাট বিরাট জাহাজ ঐ নদীপথেই যাতায়াত করত।

যাক গে, যে কথায় ছিলাম তাতে ফিরে আসি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর কোম্পানি তাদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয় বাংলার হুগলী ও ওড়িশার বালেশ্বরকে। এছাড়া ইংরেজরা আগ্রা, আমেদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বানিজ্য-কুঠি স্থাপনের অধিকার পায়।

ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যাঁরা চালাতেন, মানে তার যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, ভারতে ব্যবসা করতে আসার আগে তাঁরা তাঁদের মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেন যে কোম্পানি ভারতে শুধুমাত্র ব্যবসা করতেই যাবে; সেখানকার রাজনীতি বা সমাজতন্ত্রে কোনও ভাবেই নাক গলাবে না। ব্যবসা করতে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন সেইটুকু কূটনীতির ব্যবহার করা যাবে।

কোম্পানি ব্যবসা করতে এল ভারতে সেই নীতি নিয়ে। ব্যবসাও বেশ ফুলে ফেঁপে উঠল। কিন্তু কোম্পানিতে কর্মরত বিভিন্ন সাহেব আধিকারিক ও কর্মচারী-দের লোভ বাড়তে থাকে। তখন তারা ঐ অনুমোদিত কূটনীতি-কে অস্ত্র করে নিজেদের অত্যধিক লাভের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেন।

১৬১৫ সালে যখন স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি নিচ্ছেন, তখন কিন্তু পর্তুগীজ-রা ভারতে জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে। পশ্চিম ভারতে ইংরেজরা সুরাটে তাদের প্রধান বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না রাখলে সেখানে ব্যবসা করাই দায়। তাই ১৬৬১ সালে কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথরিন ব্রাগানজা কে বিয়ে করেন। আর বিয়ের যৌতুক হিসেবে পান গোটা বোম্বাই শহর।রাজা দ্বিতীয় চার্লস আর ইংল্যান্ড-এ বসে বোম্বাই নিয়ে কি করবেন! প্রত্যেক বছর ১০ পাউন্ড কর পাওয়ার বিনিময়ে রাজা এই বোম্বাই শহর কোম্পানিকে দিয়ে দেন।

অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি কোন সুযোগ ছাড়েনি। তারা মাদ্রাজে তৈরী করে এক সুরক্ষিত কুঠি। আউরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে শুল্ক দেওয়া নিয়ে ইংরেজ আর মোগলদের যুদ্ধ শুরু হয়। বাংলার শক্ত ঘাঁটি হুগলী ছেড়ে ইংরেজরা চলে যায়। আবার পরে দুই পক্ষের সন্ধি হলে জোব চার্ণক নামে কোম্পানির এক ইংরেজ কর্মচারী হুগলী নদীর তীরে সুতানূটি গ্রামে এক কুঠি তৈরী করেন। ধীরে ধীরে সুতানূটি, গোবিন্দপুর ও কোলকাতা গ্রাম নিয়ে পত্তন হয় কলকাতা শহরের। এর ও কিছুদিন পরে ১৭০০ শালে তৈরী হয় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। পরে যে কোলকাতা শহর ইংরেজদের ভারত শাসনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে, সে তো তোমার জানা।

মোগল সম্রাট অনুমতি দিলে কি হবে, এই বিদেশী ব্যবসায়ীদের অনেক ভারতীয় রাজাই কিন্তু পছন্দ করতেন না। বলতে গেলে এঁদের সঙ্গে ইংরেজদের আদায়-কাঁচকলায় ছিল। এঁদের মধ্যে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, হায়দরাবাদের শাসক চিন কিলিজ খাঁ, মহীশুরের রাজা দেবরাজ ও নঞ্জরাজ, অযোধ্যার শাসক সাদ্দাত খাঁ, আবুল মনসুর খাঁ, মারাঠার শাসক শাহু, বালাজি বিশ্বনাথ, বালাজি বাজিরাও, কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলি ও আরও অনেকের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়।

দিল্লীর মসনদে তখন ঢাল-তরোয়াল-বিহীন সম্রাট ফারুকশিয়র। তাঁকে ব্যবহার করে বাংলায় হঠাত্‌

জারী হয় 'ফারুকশিয়রের ফরমান'। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরাট কূটনৈতিক জয় হয় বটে, কিন্তু সারা বাংলায় আগুণ জ্বলে ওঠে।

প্রায় ১০০ বছরের কিছু বেশি দিনের গল্প শুনে ফেললে তুমি। বলতে পারো আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুপার হিরোদের যুগ শুরু হল এখান থেকেই।

বিভিন্ন পর্বে আমি পর পর সেই সব বীরগাথা তোমাকে বলব। কেমন লাগছে, আমাকে জানিও কিন্তু।

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ১

প্রথমেই বলে রাখি যে, আমার এই লেখা ইউরোপের শিল্পের ইতিহাস বর্ণনা নয়, বা ইউরোপের নামী শিল্পীদের কোনো কাহিনীও নয়। ইউনাটেড কিংডামে কাটানোর সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়ে বেড়াতে গেছি। ছোটোবেলা থেকেই শিল্পের দিকে একটা টান ছিল। এক কাকুর কাছে আঁকা শিখেছিলাম কদিন, সেইখানে কাকুর অনেক বই দেখতাম, কত বিখ্যাত বিদেশি শিল্পীর আঁকা দেখে মুগ্ধ হতাম। এখন ভেবে রোমাঞ্চ হয় যে তার মধ্যে বেশ কিছু ছবি, ভাস্কর্য্য আমি সামনে থেকে দেখে এসেছি। তেমনি কিছু স্মৃতি কিছু ছবি নিয়ে আমার এই ফটো ফিচার।

এই পর্বে রয়েছে ইউনাটেড কিংডামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা, খ্রীষ্ট পূর্ব থেকে অদূর অতীতের শিল্পের কিছু নিদর্শন নিয়ে আমার এই ছবির ডালি।

১) রোমানরা ইংল্যান্ডে আসে খ্রীষ্ট পূর্ব সময়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ড-এর "বাথ" শহর আজ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ঠান্ডার দেশে এসে এই জায়গাতেই রোমানরা খুঁজে পেয়েছিল উষ্ণ প্রস্রবন, আর গরম জলের উৎস আর অ্যাভন নদীর পাশেই গড়ে তুলেছিল এই অসাধারণ শহর। একটা গোটা শহর জুড়ে শিল্পের এরকম ছড়াছড়ি সারা বিশ্বে বিরল। ওখানকার মিউসিয়ামে রাখা আছে দুই শহস্রাব্দ আগেকার খুজে পাওয়া রোমান শিল্প।

২০০০ বছরেরও বেশী পুরোনো ব্রোঞ্জের তৈরী দেবী মিনার্ভা-র মস্তকের এই ভাস্কর্য রাখা আছে সেই মিউসিইয়ামে।

২) "গর্গন" - গ্রীক রূপকথায়ে ভয়ঙ্কর তিন বোনের গল্প আছে, স্থেনো, ইউরায়েল আর মেডুসা। সেই রূপকথারই অঙ্গ "গর্গন্স হেড" বা গর্গনের মস্তকের এক সুপ্রাচীন ভাস্কর্য রাখা আছে বাথ মিউসিয়ামে। সেই ভাস্কর্যেরই ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছিলাম আমার রোমান বাথ ভ্রমণে।

৩) প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকার হোমার লিখেছিলেন ঘোড়ার তথা সমুদ্রের দেবতা পসেইডন রথে চড়ে সাগরের ওপর দিয়ে যেতেন। পসেইডনের সেই রথ টেনে নিয়ে যেত সামুদ্রিক ঘোড়া "হিপোক্যাম্পি"। সেই হিপোক্যাম্পি-র এক মোসেক চিত্র এই ছবিতে আমরা দেখতে পাই। কোনো এক সময়ে এটি এক

রোমান প্রাসাদের মেঝেতে শোভা পেত। অসাধারণ এই শিল্পকীর্তির স্রষ্টা কে তা কেউ জানবে না। কিন্তু তার শিল্প অমর হয়ে থাকল যুগ যুগান্ত ধরে। এই ছবি রোমান বাথ মিউসিয়ামে তোলা।

৪) লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাস এক বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য জায়গা, যে কোনো ভ্রমণকারীর অবশ্য গন্তব্য। কলকাতার শ্যামবাজারের মোড়ের মতন এটাও বিভিন্ন রাস্তার সংগমস্থল। এই সংগমস্থলেই,লর্ড শাফট্সবেরীর স্মৃতিতে, ১৮৯২ সালে নির্মান করা হল "শাফট্সবেরী মনুমেন্ট মেমোরিয়াল ফাউন্টেন"। সেই ফোয়ারার চূড়ায়ে গ্রীক প্রেমের দেবতা "ইরস"-এর ভাই "অ্যান্টেরস"-এর এই কিংবদন্তী মূর্তি নির্মান করেন শিল্পী অ্যালফ্রেড গিলবার্ট। এই মর্তি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাস্কর্য যা অ্যালুমিনিয়াম কাস্টে নির্মিত এবং সেই দিক থেকে এক যুগান্তকারী শিল্প। সর্বসাধারনের সামনে রাখার জন্যে তখনকার যুগে এই নগ্ন মূর্তি নিয়ে বিতর্ক তৈরী হলেও জনসাধারণ একে গ্রহন করে। একে অনেকে "দি এঞ্জেল অফ খ্রীসচান চ্যারিটি" বলে সম্বোধন করেন।

৫) লন্ডনে গেলে রানীর বাড়ি দেখতে সবাই যাবেই। রানী থাকেন বাকিংহাম প্যালেসে। প্রয়াত রানী ভিক্টোরিয়ার মেমোরিয়াল তৈরী হয়েছিল ১৯১১ সালে ঠিক বাকিংহাম প্যালেসের সামনে।
এই সোনালি মূর্তির নাম "এঞ্জেল অফ ভিক্টরি" যা অবস্থিত এই মেমোরিয়ালের চুড়া হিসেবে। শিল্পী সার থমাস ব্রোক এই মেমোরিয়াল তৈরী করেন।

৬) "ট্রাফেলগার স্কোয়ার"। মধ্য লন্ডনের এই জায়গা সারা পৃথিবীর পর্যটক এক নামে চেনে। বিশ্বের সব থেকে বিখ্যাত "স্কোয়ার" গুলোর মধ্যে অন্যতম। সেখানকারই বিখ্যাত ফোয়ারার একাংশ আমাকে আকর্ষণ করেছিল খুব বেশি। সেই ছবি তুলেছিলাম যা মনে ধরেছিল। পাথরের গায়ে সঙ্গীতের ছোঁয়া রয়েছে এই শিল্প কীর্তির মধ্যে।

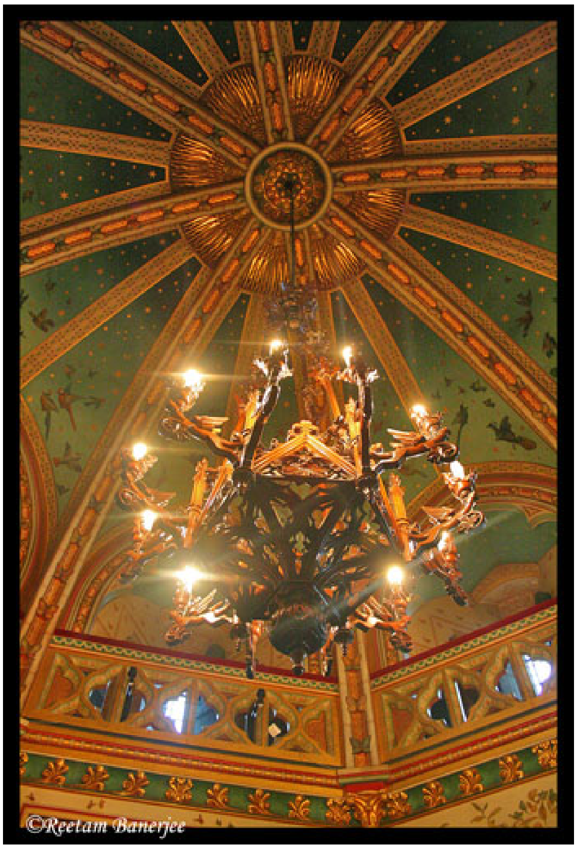

৭) "ক্যাসেল কথ্" – কার্ডিফ। কাঠের তৈরী এই আসাধারণ ঝাড় লন্ঠন এক কথায়ে অনবদ্য। কোনও এক অজানা শিল্পীর এই অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টি এখন সমান মন কাড়ে।

৮) কার্ডিফের সেন্ট ফ্যাগান্স মিউসিয়ামে রাখা আছে ওয়েল্‌স্‌ দেশের বিভিন্ন সুপ্রাচীন অখ্যাত শিল্প। এই প্রস্তর মূর্তি জীবন্ত হয়ে আছে মেঘাবৃত ইউনাইটেড কিংডামের আকাশের নীচে।

৯) "মার্চেন্ট সীফেয়ারার'স ওয়ার মেমরিয়াল"। খুব আধুনিক এই বিরাট ধাতব শিল্পকীর্তি তৈরী হয় ১৯৯৭ সালে। যে সব যোদ্ধারা কার্ডিফ এবং পেনার্থ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেরিয়ে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি, তাদের স্মৃতির উদ্দেশেই এখানে আছে "ওয়ার মেমোরিয়াল"। বিকেলের পড়ন্ত রোদে এই শায়িত মস্তক সেই সৈনিকদের করুণ অবস্থার স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

১০) ইউনাটেড কিংডামের অনেক জায়গাতেই দেখেছি, অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ কি করে বানানো যায়ে। কোনো এক গাছের গুড়ি কেটে খোদাই করে এরকম অসামান্য বেঞ্চ বানানো যায়ে তা দেখে মন ভরে গেছিল। ৩০০ বছর ধরে শাষিত-শোষিত হবার পরেও এই ইংরেজ জাতের প্রতি এক সম্মান জেগে ওঠে। এখানে এখনও শিল্প বেঁচে আছে এবং এখানকার মানুষ তার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে।

লেখা ও ছবিঃ
ঋতম ব্যানার্জী
কলকাতা

<u>দেশে-বিদেশে</u>

সূর্য দেবতার দেশে

ছবি তোলা আমার শখ। বছর দুয়েক আগে আমার তোলা একটা ছবি দেখে ন্যাশ্নল জিওগ্রাফিক এর গুনীজনেরা পছন্দ করে ফেলেন, আর আমাকে একটা খুব ভাল পুরষ্কার দেন। পুরষ্কারটা কি বলতো? আমার পুরষ্কার ছিল ন্যাশ্নল জিওগ্রাফিক এর সঙ্গে চারটে দারুণ জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, এবং আরো ভাল ছবি তুলতে শেখা। ভাব একবার!! যে ন্যাশ্নল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের দিকে সারাদিন হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকি আর অবাক হয়ে দেখি বিজ্ঞানী, পশুপ্রেমী এবং ফটোগ্রাফারদের নানারকম অসাধারণ কাজ - তাদেরই সঙ্গে কিনা একসাথে কাজ করব! এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। আর তারপর পৌঁছেও গেলাম তাদের কাছে। ঘুরে দেখলাম দক্ষিণ আলাস্কা, নিউ ইয়র্ক শহর, মেক্সিকো আর পেরু। আজ আমি তোমাকে বলব আমার পেরু ভ্রমণের গল্প।

রিপাবলিক অফ পেরু দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে একটা মাঝারি মাপের দেশ। এই দেশের একদিকে ছুঁয়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগর, আর অন্য দিকে আন্দিজ পর্বতমালা। আর আছে আমাজন অববাহিকার বিস্তীর্ণ জঙ্গল। তবে মোটে সাত-আটদিনে তো একটা পুরো দেশের সব কিছু দেখা যায়না। তাই আমরা প্রথমেই দেখতে গিয়েছিলাম পেরুর সবথেকে জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য - ইনকা সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহনকারী 'হারানো শহর' -মাচু পিচ্ছু ; দেখলাম চিনচেরো গ্রামে সাবেকি প্রথায় কাপড় বোনার নমুনা ; দেখলাম পেরুর নিজস্ব নৃত্যশৈলী - লা মারিনেরা; আর দেখলাম পেরুর সবথেকে বড় ধর্মীয় উতসব- 'লর্ড অফ মির‍্যাক্‌লস'।

দক্ষিণ আমেরিকাতে ইউরোপীয় দের আসার আগে, ইনকা সভ্যতা ছিল সবথেকে বড় সভ্যতা।ইন্‌কারা তাদের রাজনৈতিক বুদ্ধি আর শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বলে তাদের সাম্রাজ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে বহুদূর বিস্তার করে। মাচু পিচ্ছু খুব সম্ভবত তৈরি করা হয়েছিল ইন্‌কা সম্রাট পাচাকুটির আবাসস্থল হিসাবে। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মাচু পিচ্ছু বানানো শুরু হলেও একশো বছরের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে ইন্‌কারা চলে যায়। স্পেনীয়রা যখন দক্ষিণ আমেরিকায় এসে বিধ্বংসী যুদ্ধ ও লুঠতরাজ শুরু করে, তখনও তারা এই জায়গার কোন খোঁজ পায়নি। ১৯১১ সালে আমেরিকান ঐতিহাসিক হিরাম বিংহ্যাম, পাবলিতো আল্‌ভারেজ নামে এক স্থানীয় ছোট্ট ছেলের কথা শুনে এই জায়গাটাকে নতুন করে খুঁজে বার করেন।

আগুয়াস ক্যালিন্তেস শহর থেকে বাসে করে পাহাড় কেটে তৈরি করা রাস্তা বেয়ে আমরা চল্লাম মাচু পিচ্ছুর উদ্দ্যেশ্যে। মাচুপিচ্ছু সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৮০০০ ফুটের কাছাকাছি উঁচু। মাচুপিচ্ছুর বসতিটি তৈরি হয় মাচুপিচ্ছু এবং হুয়ানা পিচ্ছু- দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায়। ইনকা ভাষায় মাচুপিচ্ছু শব্দের অর্থ -'পুরোনো পাহাড়'; আর হুয়ানা পিচ্ছু শব্দের অর্থ 'নতুন পাহাড়'।

মাচু-পিচ্ছুর বাড়িগুলি সব তৈরি হয়েছিল পাথর দিয়ে। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে তৈরি করা বাড়িগুলির দেওয়াল, উঠোণ, পাঁচিল- সবই পাথর কেটে বানানো হয়েছিল। কিন্তু মজার কথা হল, এই পাথরগুলি কোন কিছু দিয়ে জোড়া দেওয়া নয়। ভূমিকম্প প্রবণ দেশ পেরু। ভূমিকম্প থেকে বাড়িঘর রক্ষা করার জন্য এই ভাবে পর পর মসৃণ পাথর সাজিয়ে ঘর বানাত ইনকারা। মাচু-পিচ্ছুকে এই কারণে বলা হয় স্থাপত্যকলার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাদের বাড়ি ঘর গুলিও তৈরি হত বিশেষ কতগুলি নিয়ম মেনে, যাতে ভূমিকম্প হলে সবথেকে কম ক্ষতি হয়।

মাচু-পিচ্চুর সবথেকে চেনা ছবি হল পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে বানানো চাষ করার জমি। পৃথিবীর অনেক দেশ সহ আমাদের দেশেও পাহাড়ী অঞ্চলে এইভাবে চাষ করা হয়।

ইনকারা তাদের মৃতদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এক বিশেষ নিয়মের সূচনা করেছিল। তারা তাদের প্রিয় মৃত মানুষ এমনকি পোষা প্রাণীদের দেহ এক বিশেষ ঘরের ভেতর রাখত এবং ফুল খাবার ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখত। আমরা দেখলাম সেইরকম একটা ঘর, যেখানে ঠিক সে পুরানো দিনের মত করে সব সাজিয়ে রাখা আছে।

সেই সময়ের মানুষ নাগরিক জীবন সম্পর্কে কত উন্নত ভাবনা চিন্তা করত, বোঝা যায় রাস্তার মাঝখানে সুন্দর ভাবে কাটা জল যাওয়ার নালা দেখে।

একটাই মাত্র বিশাল পাথর কেটে বানানো এই স্থাপত্যের নাম হল 'ইন্তিহুয়াতানা'। ইন্তিহুয়াতানা খুব সম্ভবত ছিল ইন্কাদের সূর্য ঘড়ি, কারণ ইন্কাদের ভাষায় এই শব্দের মানে হল -'যেটা সূর্য কে বেঁধে রাখে';

মাচুপিচ্চু কে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে গন্য করা হয়। ২০০৯ সালে এক ইন্টারনেট পোলের মাধ্যমে মাচু-পিচ্চুকে নতুন পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে একটি ঘোষণা করা হয়।

মাচুপিচ্চু দেখতে তো একদিন কেটে গেল। যদিও ইন্কারা যে পথে পাহাড় বেয়ে উঠত, সেই ইন্কা ট্রেইল ধরে ওপরে ওঠা বা নামা হল না।

পরের দিন আমরা গেলাম চিঞ্চেরো বলে এক জায়গায়। এইখানে এখনও সেই প্রাচীন ইন্কা পদ্ধতিতে কাপড় বোনা এবং রঙ করা হয়। চিঞ্চেরোর অধিবাসীরা এখনও সেই পুরানো প্রথা কে সযত্নে ধরে রেখেছেন। এই প্রথা ধরে রাখার পেছনে ন্যাশ্নল জিওগ্রাফিক এর অবশ্য একটা বড় ভূমিকা আছে

চিঞ্চেরোতে দিনের বেলা খোলা বাজারে বিক্রি হয় এইসব কাপড়। এর রঙ নষ্ট হয় না, এবং কাপড়গুলি খুব আরামদায়ক।

তারপর আমরা দেখলাম লা মারিনেরা, পেরুর জাতীয় নৃত্যশৈলী। এই শৈলীতে একসাথে ছেলে এবং মেয়েরা নাচ করে; তাদের এক হাতে থাকে রুমাল। অন্য হাতে ধরা থাকে টুপি এবং পরনের স্কার্টের কুঁচি।

পেরুর গল্প শেষ করব 'লর্ড অফ মিরাক্‌লস' এর ছবি দেখে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে, পেরুর রাজধানী লিমার এক দেওয়ালে, লর্ড অফ মিরাক্‌লস বা কৃষ্ণকায় যিশুর মুরাল এঁকেছিলেন বেনিতো নামের এক কৃতদাস। ১৬৫৫,১৬৮৭ এবং ১৭৪৬ সালে পেরুতে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। খুবই বিস্ময়করভাবে, এই সমস্ত সময়ে, ওই বিশেষ দেওয়ালটিতে কোন ফাটল ধরেনি বা সেটি ভেঙ্গেও পড়েনি। এই অদ্ভূত ঘটনা দেখে মানুষের মনে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জেগে ওঠে; সেই কৃষ্ণকায় যিশুর নাম হয়ে যায় 'লর্ড অফ মিরাক্‌লস'। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দেওয়াল ঘিরে তৈরি হয় 'চার্চ অফ নাজারেনাস'।

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের কয়েকটি বিশেষ দিনে 'লর্ড অফ মিরাক্‌লস' এর উপাসনা করা হয় লিমার রাস্তা শোভাযাত্রা করে। ফুল আর বেগুনী রঙের বেলুন দিয়ে সাজানো হয় গোটা নগর, সবাই বেগুনী রঙের পোশাক পরে।

দুই টন ওজনের সেই মুরাল টিকে নিয়ে বিভিন্ন উপাসকের দল শোভাযাত্রা করে যান নগরের বিভিন্ন রাস্তায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন অগুন্তি মানুষ।

ভাবলে বেশ অবাক লাগে, তাই না? এই ছবিটা আমাদের খুব পরিচিত একটা ছবির মত, ঠিক কিনা? আমরাও তো দুর্গাপুজোর সময়ে সাজিয়ে তুলি আমাদের শহর গ্রাম, আর ঠিক এইভাবেই পুজোর পাঁচদিনের শেষে, প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা করে ভাসান দিতে যাই, তাই না?

যে দেশেই হোক না কেন তোমার বাড়ি, যাই বা হোক তোমার ভাষা, ধর্ম, পোষাক, বা গায়ের রঙ --- সৃষ্টির আনন্দ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, একে অপরকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা - দেশ-কাল নির্বিশেষে মানুষের মনের ভাবনাগুলি কিন্তু সর্বত্রই এক। তাই আমরা কয়েক হাজার বছর পরেও মাচুপিচ্চুতে ইনকাদের সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হই, মারিনেরা দেখে আনন্দ পাই আর 'লর্ড অফ মিরাক্‌লস' এর শোভাযাত্রায় গিয়ে আমাদের মাথা বিশ্বাসে নুয়ে পড়ে।

ছবি ও তথ্যঃ

আশিস্‌ সান্যাল
কলকাতা

অনুলিখনঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

দুইদিনে নিউ ইয়র্ক

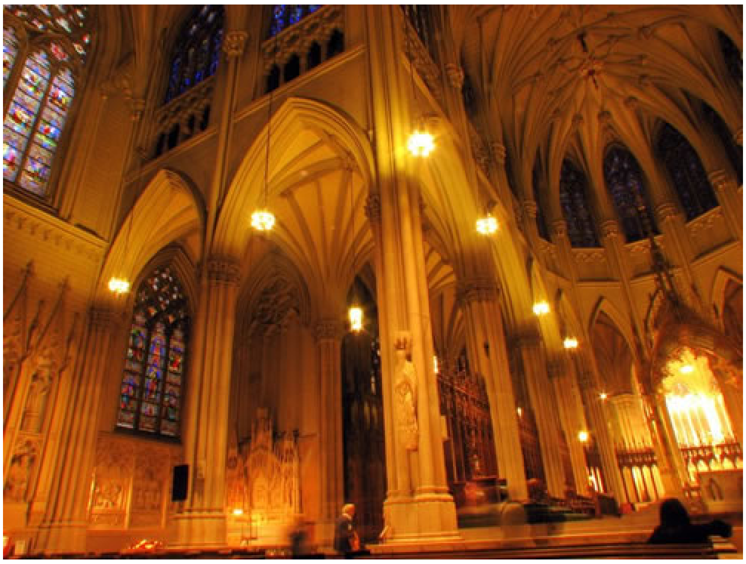

এই শহরে ২০২৭ টা ব্রিজ, অসংখ নদীর তলা দিয়ে রাস্তা (Tunnel), এটা একটা পোতাশ্রয়। পশ্চিমে হাডসন নদী, পূর্ব দিকে ইষ্ট নদী, উত্তরে হারলেম নদী। ৪৮৬ ট্রেন স্টেশন্‌, ২৪ ঘন্টা ট্রেন চলাচল করে, যেখানে আছে হাওড়া ব্রীজের মত ব্রীজ, বিদ্যাসাগর সেতুর মত ব্রীজ, ঘাড় ব্যাথা হয়ে যায় বহুতল স্কাইস্ক্রেপার, আকাশছোঁয়া বাড়ি দেখতে দেখতে – বোধ হয় বুঝতে পেরেছো এবারে আমরা যাব নিউ ইয়র্ক শহরে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক রাজ্যে।

এই শহর টাকে জানতে হলে আমাদের যেতে হবে ১৬১৪ সালে। যখন ডাচ বাবস্যায়ীরা এই দ্বীপ এ আসে ফারের ব্যাবসা করবে বোলে। ডাচরা বুঝতে পারে যে ব্যাবসা ভাল করতে গেলে এই দ্বীপ টা দখলে রাখতে হবে। ডাচরা আমেরিকান ইন্ডিয়ান থেকে কিনে নিয়ে নাম দিলেন নিউ আমস্টারডাম। ডাচদের ব্যাবসা রমরমা হল।

সাল ১৬৬৪। ইংরেজের ও ডাচদের যুদ্ধে ইংরেজরা জিতছে। ইংরেজরা দখল নিল নিউ আমস্টারডাম শহরের। নাম বদলে নতুন নাম দিল নিউ ইয়র্ক। ইংরেজরা ব্যাবসা রম রমা করে চলে পরের ১০০ বছর ধরে।

সাল ১৭৮৯ – এরপর শুরু হল আমেরিকান – ইংরেজ যুদ্ধ। আমেরিকানরা দখল নিল নিউ ইয়র্ক এর। যুদ্ধে জয়ের পর নিউ ইয়র্ক শহরকে রাজধানী বলে ঘোষণা করল আমেরিকা। নিউ ইয়র্ক শহর ব্যাবসা ও রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠলো। আইরিশ, স্কটিশ অনাবাসীরা সবাই নিউ ইয়র্ক আসতে লাগলো। নিউ ইয়র্ক সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠল।

সাল ১৯০৪ – নিউ ইয়র্ক শহরে ট্রেন ব্যাবস্থা সুরু হল। একদিকে জাহাজ এর বন্দর, অন্য দিকে ট্রেন, গোটা পৃথিবী থেকে ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করলো নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্কের আধুনিকীকরন শুরু হল। আজ নিউ ইয়র্ক আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল শহর। শহরে ঘুরলে দেখা যায় পুরোনো ও নতুনের সহাবস্থান।

শহর ঘুরে দেখার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দোতলা বাসে করে ঘোরা। এই বাসের মাথার ওপরটা খোলা।

পিউ আর আমি ঠিক করলাম – আমরা নিজেরা হেঁটে হেঁটে আর ট্রেনে ঘুরবো। প্রথম জায়গা দেখার মত হল – গ্রান্ড সেন্ট্রাল টারমিনাল। ১৯১৩ সালে তৈরী। ৭৫ টা ট্রেন লাইন আর ৪৮টা প্লাটফর্ম এক জায়গায়। ভাবা যায়!

গ্রান্ড সেন্ট্রাল টারমিনাল – গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখক ট্রেন প্লাটফর্ম আছে যে স্টেশনে। রোজ ৭৫০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০ লোক যাতায়াত করে এই ট্রেন স্টেশন দিয়ে। স্টেশনের মেঝেটা ঝকঝকে তকতকে। স্টেশনের ছাদে অনেক কারুকার্য করা।

গ্রান্ড সেন্ট্রাল টারমিনাল থেকে বাইরে বেরীয়ে তাকালে দেখা যায় ক্রাইসলার বিল্ডিং (Chrysler Building), ১০৪৭ ফুট উঁচু। সারা পৃথিবীতে প্রথম মানুষের তৈরী বাড়ি যেটা ১০০০ ফুটের বেশি লম্বা। ১৯৩০ সালে ১১ মাসের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। ২০ মাসের মধ্যে বাড়িটা তৈরী হয়েছিল।

এরপর গন্তব্যস্থল হল সেইন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রাল। ১৫০ বছরের এর বেশী পুরোনো ক্যাথেড্রাল। ভেতর ঢুকলে কারুকার্য্য দেখে অবাক হতে হয়। স্পাইডার ম্যান চলচ্চিত্রে এই কাথেড্রাল দেখিয়ে ছিল।

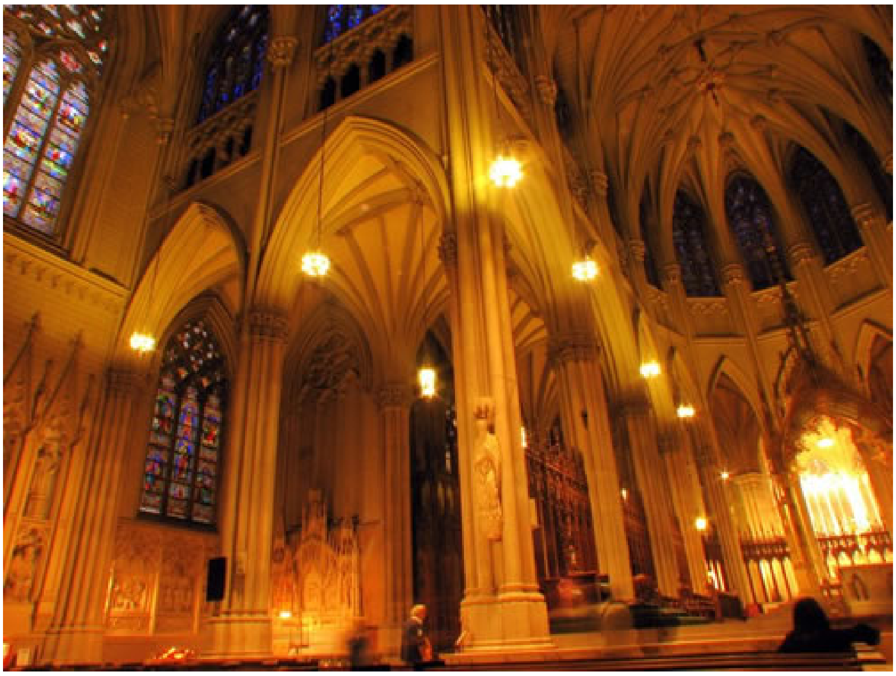

এত ঘুরতে ঘুরতে আমাদের খিদে পেয়ে গেল। বলোতো কি খেলাম আমরা। এগ রোল!! নিউ ইয়র্ক শহরে হেন দেশের খাবার নেই যা পাওয়া যায় না। লোভ লাগছে নাকি এগ রোলের ছবিটা দেখে! লোভ দিয়ে লাভ নেই – সব হজম হয়ে গেছে!!

খেয়ে দেয়ে আবার যাত্রা শুরু। এবার আসলাম ইউনাইটেড নেশন্স্ এর সামনে। দেখলেই বোঝা যায় – সামনে সব দেশের জাতীয় পতাকা আছে।

তারপর আমরা চলে গেলাম একদম দক্ষিন প্রান্তে। ওয়াল স্ট্রীট। সেখানেই আছে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (NYSE)। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শেয়ার কেনাবেচা হয় এখানে – নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ - এ।

এখানে ব্যবসা চলছে ১৭৯২ সাল থেকে। ওখানেই আছে একটা ষাঁড়ের (Bull) মূর্তি। শেয়ারের দাম বাড়লে বলে 'ষাঁড় দৌড়চ্ছে'।

তার কাছাকাছি ছিল – ওয়র্ল্ড ট্রেড সেন্টার (World Trade center)। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ১১০ তলা উঁচু দুটি বাড়ি। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনে নষ্ট হয়ে গেছে বাড়ি দুটো আজ থেকে নয় বছর আগে। গোটা পৃথিবী জানে সে কথা। প্রার্থনা করি আর কোথাও কোনো দিন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তী না হয়। মৃতদের শ্রদ্ধা জানাতে আজ বাড়ি গুলোর জায়গায় স্মৃতির ফলক।

দেখতে দেখতে দিন শেষ হল। রাতের নিউ ইয়র্ক অন্য চেহারা। বিল বোর্ড, নিয়ন বাতির আলোয় টাইমস্ স্কোয়ার। পথচারীদের জায়গা। মজার জায়গা। বিল বোর্ড, লোক দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় বোঝাই যায় না।

আরেকটা সহজে শহর দেখার উপায় হল জলপথে ঘোরা। আমরা ক্রুইস এর জাহাজ নিলাম। বিশাল জাহাজ, প্রায় শ'পাঁচেক লোক। জাহাজটা আমাদের মানহাটান দ্বীপ এর চার দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। আমি কিছু ব্রীজ এর ছবি এখানে দিলাম।

এটা ব্রুকলীন ব্রিজ। ১৮৮৩ সালে শুরু। সাসপেনশন জাতীয়। ভারতে লক্ষমন ঝোলার ব্রীজ হল সাসপেনশন জাতীয়।

এরপরের ব্রীজটা দোতলা! মানহাটান ব্রীজ। দোতলা বাস এর মত ব্রীজ এক তলা দিয়ে শুধু গাড়ি; কিন্তু নিচের তলা দিয়ে ট্রেন ও যায়।

এই জাহাজটা নিউ ইয়র্ক এর আরেকটা দ্রষ্টব্য, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির একদম কাছ দিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের স্বাধীনতার আরেক মুখ। হাতে মশাল ও আইনের বই। পায়ের কাছে ভাঙা বন্ধন শিকল।

শুধু পথচারী আর সাইকেল আরোহীদের জন্য এই ব্রীজটা। নাম – ওয়ারড আইলান্ড ব্রীজ।

জর্জ ওয়াশিংটন ব্রীজ। দোতলা ব্রীজ। ৮ টা গাড়ী ওপরে আর ৬ টা গাড়ী নিচে পাশাপাশি যেতে পারে।

এই ব্রীজটা খুব মজার। ম্যাক্কম্‌স্ ড্যাম ব্রীজ। এটা সুইং ব্রীজ। ব্রীজের মধ্য ভাগ ৯০ ডিগ্রী ঘুরে যায়। ব্রীজ খুলে গেলে জাহাজ সহজ ভাবে যেতে পারে।

হাই ব্রীজ বা অ্যাকুয়াডাক্ট ব্রীজ। এটা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, কারন এক সময় নিউ ইয়র্ক শহরে জলের সরবরাহ হত এর মাধ্যমে।

এই শহরে দেখার শেষ নেই। ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন খাদ্যের মিলন এখানে। আমরা আরজেন্টিনার খাবার খেতে ব্যস্ত।

খুব ভাল ঘুরেছি আমরা, খুব খেয়েছি, আনন্দ করেছি। আজ এখানেই শেষ করি। পুজোয় খুব আনন্দ করো, খুব হই চই করো।

লেখাঃ
দেবাশীষ পাল
ছবিঃ
পিউ মল্লিক
রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

বায়োস্কোপের বারোকথা: কলকাতায় প্রথম যুগের সিনেমা

(গত সংখ্যার পর)

গত সংখ্যায় তো বলেছিলাম কিভবে ম্যাডান থিয়েটার হয়ে উঠেছিল কলকাতার প্রথম বায়োস্কোপ কোম্পানি, এবং বানিয়েছিলেন প্রথম কাহিনীচিত্র 'সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্র'।

ম্যাডানরা দুবছর বাদে আরো বড় ছবি বানালেন, নাম 'বিল্বমঙ্গল'। এই ছবি এমনকি বাংলার সুদূর বরিশাল শহরেও দেখানো হয়েছিল। বাংলার পূবদিকে (তখনও বঙ্গভঙ্গ হয়নি) ১৮৯৮ সালে ২৮শে এপ্রিল, ভোলার এস ডি ও বাংলোয় প্রথম ছবি দেখান হীরালাল সেন। তার কয়েকদিন পরেই ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে কলকাতার ব্রেডফোর্ড কোম্পানি জনসাধারনের জন্য কয়েকটি ছবি দেখান।

বিল্বমঙ্গল ছবির বিজ্ঞাপন

সে যুগের প্রযোজকদের ছবি, বিশেষভাবে ম্যাডানদের ছবি সিনেমার বানানোর নানা ঘরানার এক ধরনের অগোছালো মেলামেশা ছিল। চিত্রনাট্য তেমন কিছু থাকত না। ক্যামেরাম্যান ছিলেন সর্বেসর্বা। যেমন তেমন করে মাস চারেকের মধ্যে শেষ করে দেওয়া হত একেকটা 'বই'। সিনেমা সম্পর্কে ম্যাডানদের কি ধারনা ছিল বোঝা যায় যখন দেখি তাদের প্রথম দুজন পরিচালক ছিলেন তাদেরই প্রতিষ্ঠান এর টাইপিস্ট প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়। ম্যাডান কোম্পানির অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসতেন পেশাদার রংগমঞ্চ ও কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ থেকে।তখন তো সিনেমা তে শব্দ ছিল না; তাই বাংলা বলার কোন দায় ছিল না। যেজন্য সীতা দেবী (নীনা স্মিথ) বা ইন্দ্রা দেবী (এফী হিপ্পোলেট) - এই দুজন দেশি মেমসাহেব হয়ে উঠেছিলেন আমাদের প্রধান নায়িকা। সঙ্গে ছিলেন দানীবাবু, দুর্গাদাসবাবু বা নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যাঁরা সবাই আদতে নাট্য অভিনেতা ছিলেন। স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ী যে চলচ্চিত্র জগতে আশে, তাও কিন্তু মূলতঃ ম্যাডানদের অবদান।

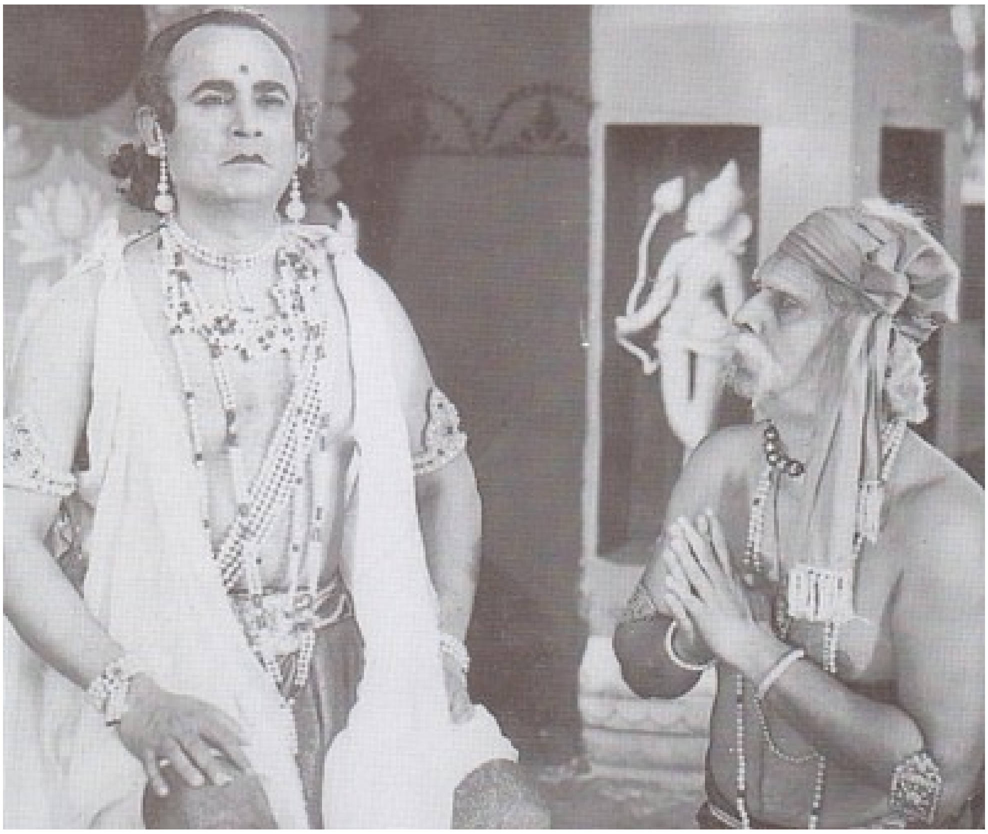

শিশির কুমার ভাদুড়ি (বাঁদিকে)

কলকাতার ছবি, আমার মনে হয়, প্রথম একটু ছবি হয়ে উঠল, যখন ধীরেন গাঙ্গুলি মশাই 'বিলেত ফেরত' বা 'England Returned' নামে ছবিটিতে অভিনয় করলেন। সারা দেশই তখন ইংরেজদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণ পোষণ করছে। ধীরেন গাঙ্গুলি ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং সূদূর হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজে কলা শিক্ষকতা করতেন। তাই তাঁর তৈরি করা ছবিতে একটু অন্যরকম ভাবনা চিন্তা এল। তিনি তাঁর ছবিতে নকল সাহেবদের ঠাট্টা করার সাহস দেখালেন। নিরস তথ্য বা পুরাণের মহিমা নয়, বললেন চোখে দেখা জীবনের গল্প। তাই এই ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয় হল।

'England Returned': Dhiren Ganguly in his film of 1921, where he satirises the extreme attitudes taken by the 'foreign-returned' on the one hand, and the stay-at-homers on the other.

ধীরেন বসু

ক্রমশঃই ছবির জগতে ভীড় বাড়তে থাকে। ১৯২২ সালে বছরে ১৫টি ছবি তৈরি হয়। আরেকটা হিসাব দেখায়, টাকাপয়সার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩০ সালে ২২টি ছবি তৈরি হয়। বাঙালি প্রযোজকদের সঙ্খ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই অনাদি বসু তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত অরোরা স্টুডিও। ১৯৩৬ সালের আগে অরোরার নিজস্ব স্টুডিও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ম্যাডান কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্যচিত্র বানিয়ে গিয়েছেন। এরা কংগ্রেস অধিবেশন এর দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার প্রামাণ্য নথিচিত্র বানিয়ে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদের পাট চুকিয়ে ধীরেন গাঙ্গুলি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। হ্যারিসন রোডের ফুটপাথে তিনি একজন শিক্ষিত ছেলেকে গামছা বিক্রি করতে দেখে উতসুক হয়ে জানলেন যে সে গান্ধীজীর অসহযোগ মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েই এমন স্বদেশী পেশা বেছে নিয়েছে। এই যুবকটিকে তিনি নবগঠিত বৃটীশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানিতে সুযোগ দিলেন। রাজপুতানার জহরব্রতের আদর্শে অনুপ্রাণিত 'ফ্লেইম্‌স্‌ অফ ফ্লেশ' তাঁরই চিত্রনাট্য। তিনিই বাংলার প্রথম স্বকীয়তায় ঝলমলে পরিচালক- দেবকী কুমার বসু। তার কিছুদিন পরেই এই কোম্পানি খুঁজে বার করেন বাংলা ছবির জগতের আরেক তারকা- প্রমথেশ বড়ুয়াকে।

সেইসব গল্প আগামি সংখ্যায়।

অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

[পরশমণি: সংখ্যা নিয়ে খেলা]

পাসকালের ত্রিভূজ

অনেকের ক্ষেত্রেই ছোটবেলায় মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে অঙ্ক বা গণিত হল একটা খুব নীরস বিষয়। এই ভুল ধারণাই অনেক সময় বিষয়টাকে ভাল না বাসা আর অবহেলা করার কারণ। আর তার থেকেই অনেক সময় তৈরী হয় অকারণ ভয় আর দুশ্চিন্তার। সত্যি কথা বলতে গণিতের বিভিন্ন বিষয় নীরস হওয়া তো দূরের কথা, বরং খুবই মজার, রহস্যময় আর উপভোগ্য। আর এই মজাটা ধরতে পারলেই দেখবে খুব ভাল লাগছে, কোন ভয়েরও কারণ নেই। আর তোমার যদি এর মধ্যেই অঙ্ককে বেশ প্রিয় বিষয় বলে মনে হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। তার মানে তুমি এই মজাটা জেনেশুনে বা নিজের অজান্তেই ঠিক বুঝতে পেরে গেছ। গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শুধুমাত্র Number Theory বা সংখ্যাতত্ত্বের মজার রহস্যগুলো নিয়েই এত বই লেখা হয়েছে যে সেগুলো একসাথে করলে অনেক বড় বড় বইয়ের তাক ভর্তি হয়ে যাবে। আমি আজ সেরকমই একটা মজার জিনিস দেখাব।

প্রথমে কিছু সংখ্যাকে কয়েকটা সারিতে পরপর লিখে ফেলি।

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

পাসকাল-এর ত্রিভূজ

খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পারছ যে প্রথম সারিতে রয়েছে একটা সংখ্যা, দ্বিতীয় সারিতে দুটো সংখ্যা, তৃতীয় সারিতে তিনটে এবং এইভাবে ক্রমশঃ বাড়তে থেকেছে। তা ছাড়াও সহজেই দেখতে পারছ যে প্রতি সারির প্রথম আর শেষ সংখ্যাটা হল '1'। কিন্তু অন্য সংখ্যাগুলো এল কোথা থেকে? ওগুলো কি আমি এমনিই মন থেকে ইচ্ছেমত লিখে গেলাম? আরেকটু ভাল করে দেখ ত ওদের মধ্যে কোন নক্সা খুঁজে পাচ্ছ কি না! যদি বলি যেকোন সারির পাশাপাশি দুটো সংখ্যার যোগফল তার ঠিক নীচের সারির তাদের মাঝের সংখ্যাটা, তাহলে কি নক্সাটা দেখতে পারছ? মিলিয়ে দেখ ত!

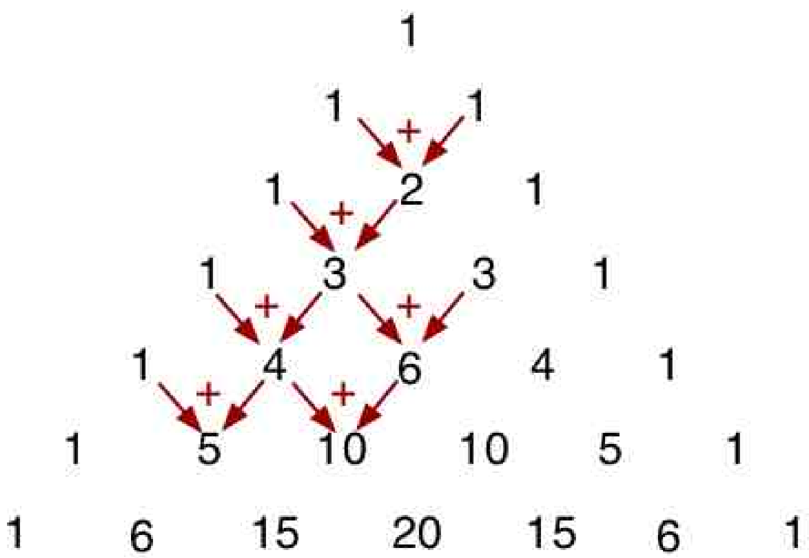

"পাশাপাশি দুটো সংখ্যার যোগফল নীচের সারির মাঝের সংখ্যার সমান"

এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। উপরের ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে সেটাই দেখিয়েছি। আর এবার তুমি ইচ্ছে করলে এই নিয়মটা মাথায় রেখে একের পর এক সারি এইভাবে লিখে ফেলতে পার। তাহলে চট্ করে একটা পেন বা পেন্সিল আর একটা কাগজ নিয়ে শুরু করে দাও। বাহ্, বেশ মজার না? এই সংখ্যার ত্রিভূজের মধ্যে আরও অনেক মজা লুকিয়ে আছে। সেগুলো একে একে বলছি। কিন্তু তার আগে এর ইতিহাস আর নামকরণের কথা একটু জেনে নেওয়া যাক।

সংখ্যার এই ত্রিভূজের বর্তমান নামকরণ হয়েছে সপ্তদশ শতকের ফরাসী গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ্, আবিষ্কারক, লেখক ব্লেজ পাসকাল-এর নাম অনুসারে। ১৬৫৩ সালে পাসকাল তার এক পান্ডুলিপিতে এই ত্রিভূজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আর গণিতের বিভিন্ন বিভাগে এর প্রয়োগ আর উপযোগিতার কথা একত্রিত করে লেখেন, যা তার মৃত্যুর পর ১৬৬৫ সালে প্রকাশিত হয় 'ট্রিট্রিজ্ অব্ অ্যারিথমেটিক ট্র্যায়াঙ্গল' নামে। যদিও তার অনেক আগেই ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস এবং ইতালির গণিতজ্ঞদের কাজে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ভারতের পিঙ্গল, পারস্যের আল-কারাজী, ওমর খৈয়াম, চীনের চিয়া সিয়েন, ইয়াং হুই - এদের লেখাতে এই সংখ্যার ত্রিভূজের কিছু প্রয়োগের কথা জানা যায়। কিন্তু, যেহেতু পাসকাল-ই প্রথম সামগ্রিকভাবে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাই বহুলভাবে এর পরিচিতি হয় Pascal's triangle বা পাসকাল-এর ত্রিভূজ নামে।

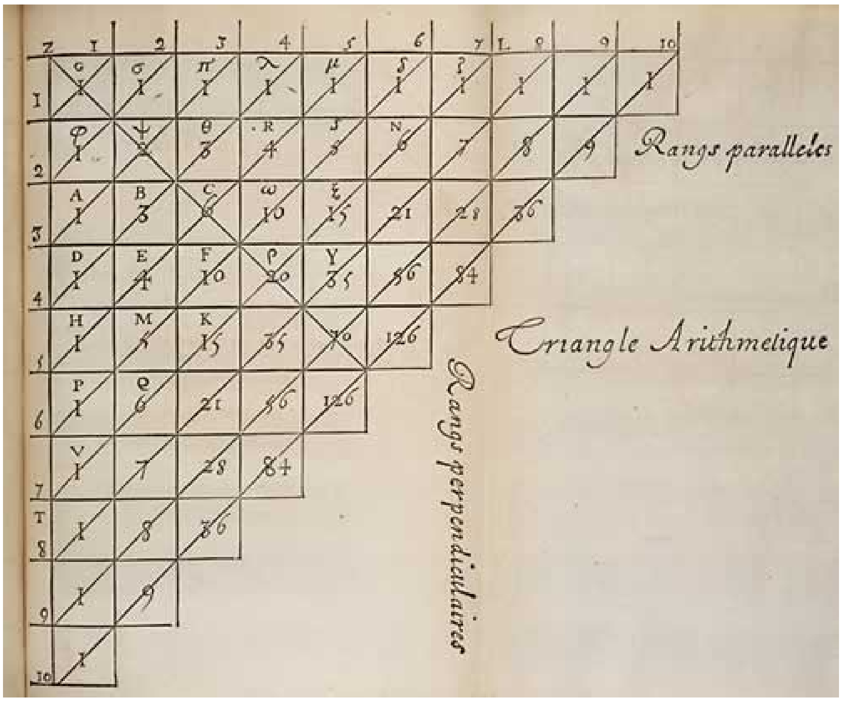

ব্লেজ পাসকাল-এর পান্ডুলিপি"

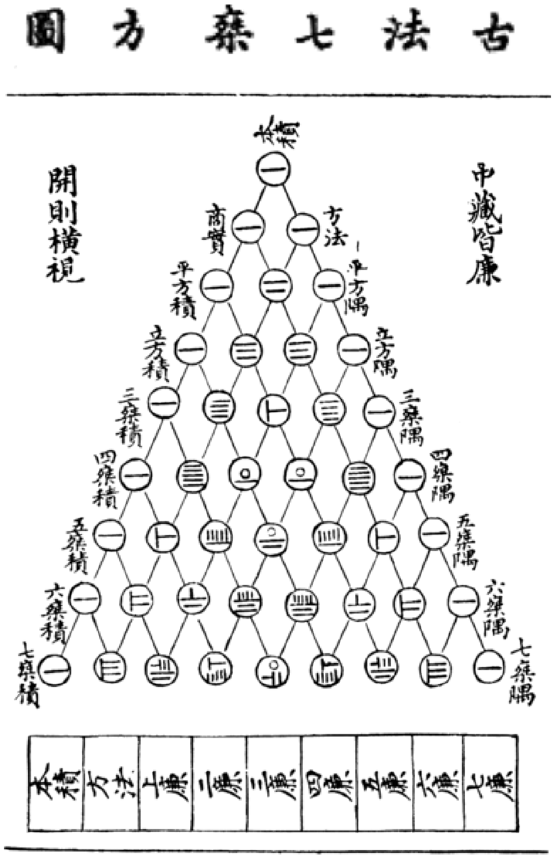

ইয়াং হুই-এর পান্ডুলিপি"

এবারে চলো আমরা এই ত্রিভূজের আরও কিছু রহস্য জেনে নিই। যদি এই ত্রিভূজের দ্বিতীয় সারির প্রথম বা শেষ '1' থেকে শুরু করে কোণাকুণি নীচের দিকে যেতে থাক, তাহলে দেখবে 1, 2, 3, 4, ... করে পরপর সংখ্যাগুলো পেয়ে যাচ্ছ।

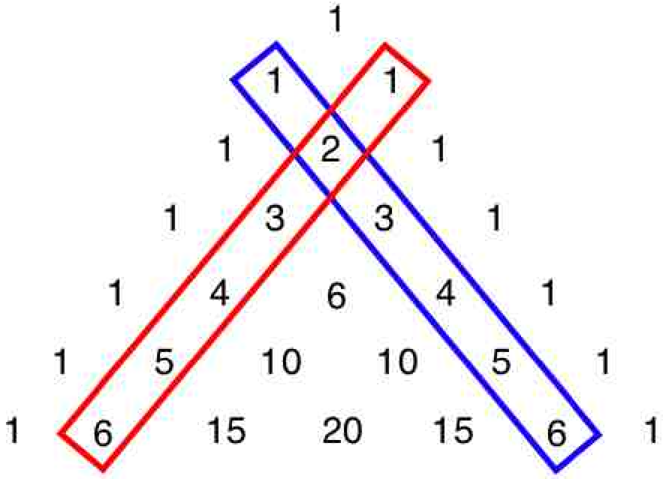

সংখ্যাগুলো নিয়ে আরেকটু খেলা করে দেখা যাক। যদি প্রতি সারির সংখ্যাগুলি পাশাপাশি যোগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। প্রথম সারিতে 1, দ্বিতীয় সারিতে 1+1=2, তৃতীয় সারিতে 1+2+1=4, চতুর্থ সারিতে 1+3+3+1=8, পঞ্চম সারিতে 1+4+6+4+1=16, এভাবে চলতে থাকবে। প্রতি সারির এই যোগফলগুলো 1, 2, 4, 8, 16, ... –এদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করছ কি? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। প্রতি সারির যোগফল তার ঠিক আগের সারির যোগফলের 2 গুণ হয়ে যাচ্ছে। 1 এর পরে 2, 2 এর পর 4, 4 এর পর 8, ... এইভাবে।

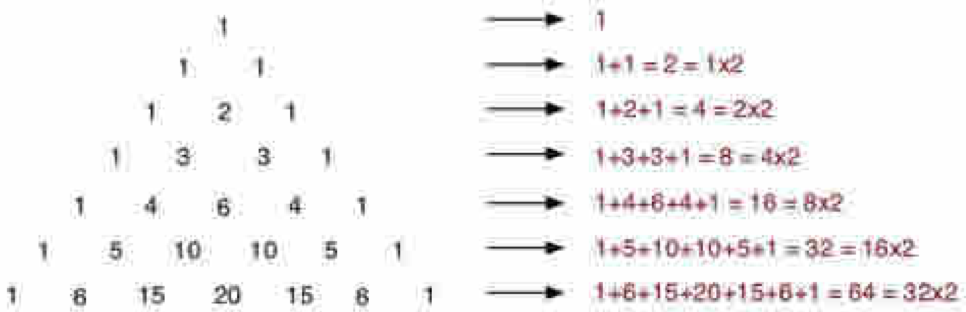

"সারির যোগফল"

অবাক হচ্ছো আর বেশ মজা লাগছে তো! এবার তাহলে আরেক কাজ করো। যেকোন সারির প্রথম বা শেষ '1' থেকে শুরু করে কোণাকুণি নীচের দিকে যেতে থাক এবং এক জায়গায় এসে থামো। এই কোণাকুণি পথে যে সংখ্যাগুলো পেলে সেগুলো পরপর যোগ করলে যে সংখ্যাটা পাবে, সেই সংখ্যাটা আছে কোণাকুণি পথটার ঠিক নীচে, পথটা যে দিকে যাচ্ছিল তার বিপরীত দিকে। নীচের ছবিতে যেমন লাল রঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে 1, 2, 3 যোগ করে পাওয়া যাচ্ছে 6, আবার নীল রঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে 1, 3, 6, 10 যোগ করে পাওয়া যাচ্ছে 20। তোমরা নিজেদের ইচ্ছেমত অন্য জায়গা থেকে শুরু করে, আর এই নিয়ম মেনে যতটা ইচ্ছে নীচের দিকে গিয়ে মিলিয়ে দেখতে পার।

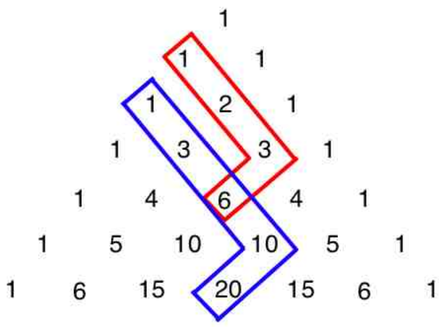

"কোণাকুণি যোগফল"

এবারে আরেকটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রতি সারিতে সংখ্যাগুলি পাশাপাশি রেখে যে বড় সংখ্যাগুলি পাবে, সেগুলি হল, প্রথম সারিতে 1, দ্বিতীয় সারিতে 11, তৃতীয় সারিতে 121, চতুর্থ সারিতে 1331, পঞ্চম সারিতে 14641। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য হল, 1 কে 11 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 11, 11 কে 11 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 121, 121 কে 11 দিয়ে গুণ করলে হয় 1331, 1331 কে 11 দিয়ে গুণ করলে হয় 14641। অবাক হচ্ছো তো! তাহলে নিজেরাই একবার গুণ করে মিলিয়ে দেখ।

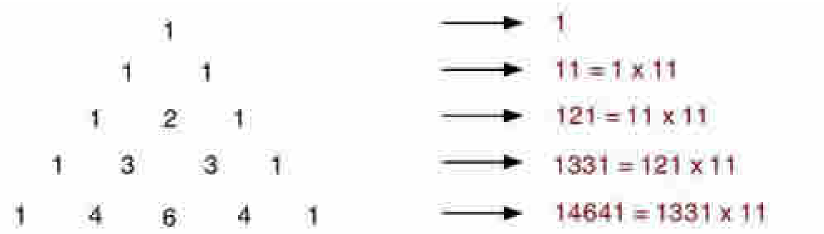

"11-এর মজার কথা"

মানে প্রতি সারিতে সংখ্যাগুলি তার ঠিক আগের সারির সংখ্যার 11 গুণ হয়ে যাচ্ছে। ষষ্ঠ সারি থেকে যেহেতু কোন কোন জায়গায় এক-digit এর থেকে বড় সংখ্যা থাকতে পারে, তাই শুধুমাত্র সংখ্যাগুলো পাশাপাশি বসিয়ে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ্য করা যাবে না। যেমন ধর, ষষ্ঠ সারিতে সংখ্যাগুলো পাশাপাশি বসিয়ে পাওয়া যায় 15101051। এটা কিন্তু মোটেই আগের সারির 14641 আর 11 -এর গুণফল নয়। মজার খেলাটা মাঝপথে ভেঙ্গে যাওয়ায় কি একটু মন খারাপ হয়ে গেল? দাঁড়াও, আরেকটু সতর্ক হয়ে বড় সংখ্যাটা তৈরী করলে হয়তো এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। নীচের ছবিতে সেটাই দেখিয়েছি।

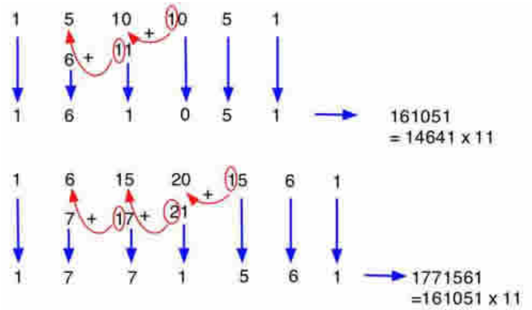

দেখলে বুঝতে পারবে, ডানদিক থেকে শুরু করে 1, 5 -এর পর আমরা যখন 10 পেলাম, তখন

তার শুধু 0 রেখে বাকি সংখ্যাটা অর্থাৎ 1 কে তার বাঁদিকের 10 এর সাথে যোগ করে পেলাম 11। একইরকম ভাবে 11 -এর 1 কে রেখে দিয়ে বাকি 1 কে তার বাঁদিকের 5 এর সাথে যোগ করে পাওয়া গেল 6, আর সবশেষে পরে থাকল একদম বাঁদিকের 1। এইভাবে যে সংখ্যাটা তৈরী হল সেটা হল তাহলে 161051, এবং আশ্চর্যজনকভাবে এটাই 14641 আর 11 এর গুণফল। এই নিয়ম পরের সারির সংখ্যাগুলোর উপর প্রয়োগ করে তুমি পেয়ে যাবে 1771561, যেটা নাকি 161051 আর 11 এর গুণফল! এবারে খুশি তো তাহলে?

যাক্, পাসকাল-এর ত্রিভূজের আরও রহস্যের কথা বলতে গেলে আজ আর কথা শেষ হবে না। দেখা গেছে যে গণিতের জ্যামিতি (geometry), ত্রিকোণমিতি (trigonometry), বীজগণিত (algebra) এবং calculus-এর বিভিন্ন জায়গায় পাসকাল-এর ত্রিভূজের ব্যবহার রয়েছে। দেখলে তো তাহলে কত সহজ একদল সংখ্যার মধ্যে কতরকম রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে! যখন উঁচু ক্লাসে উঠে গণিতের আরও কঠিন বিষয়গুলো আয়ত্ত করবে, তখন তুমি এর সাথে আরও পরিচিত হবে। আর তাহলে এখন থেকে এই মজার ব্যাপারগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেই দেখবে সব কিছু আরও অনেক উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

লেখাঃ
পাভেল ঘোষ
টেম্প, আরিজোনা

ছবিঃ
পাভেল ঘোষ
উইকিপিডিয়া

জানা-অজানা

কোথায় গেল ডোডো

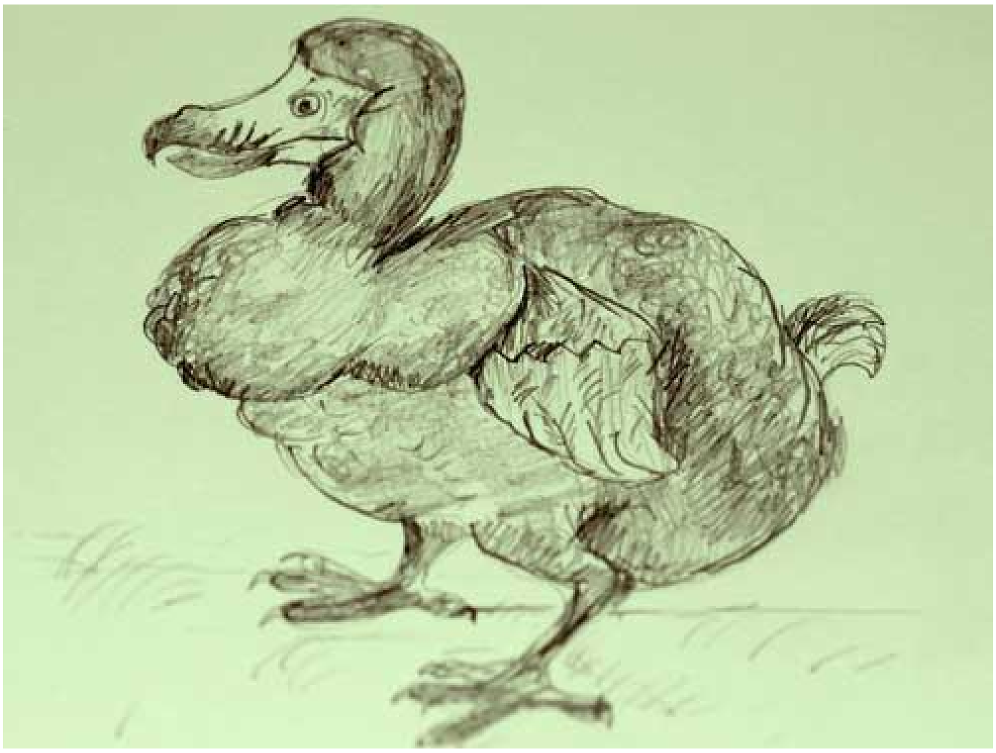

ডোডো পাখির নাম শুনেছো? শুনে থাকাটা নতুন কিছু নয়। আমরা অনেকেই শুনেছি। যে সমস্ত প্রানী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে চিরকালের মত, তাদের উদাহরন হিসেবে ডোডো পাখির নাম আমরা অনেক জায়গাতেই পেয়ে থাকি। ইংরাজী ভাষাতে তো ডোডোকে নিয়ে রীতিমত একটা প্রবাদবাক্য চালু আছে –'ডেড এস এ ডোডো'। কিন্তু আমরা কি জানি সেই পাখি কেমন ছিল? কোথায় থাকতো তারা? কি করেই বা তারা হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে? ঠিক করেছি আজ সেই গল্পই শোনাব তোমাকে। আমাদের এই পৃথিবী থেকে কত প্রানীই হারিয়ে গেছে চিরতরে। কিছু প্রানী হারিয়ে গেছে প্রকৃতিতে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে – তাদের অস্তিত্ব শুধু টিকে আছে অভয়ারন্য, চিড়িয়াখানায় বা সাফারি পার্কে। আজকের পৃথিবীতে বন্যপ্রানী সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতটুকু তা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে ডোডোর কাহিনী আমাদের জানা খুব প্রয়োজন।

ডোডো কোথায় পাওয়া যেত? তা কেবলমাত্র একটা জায়গাতেই। ভারত মহাসাগরের ওপর ভারতবর্ষ আর মাদাগাস্করের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট দ্বীপ মরিশাসে। সেখানেই ছিল ডোডোর বাসস্থান। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে তিন ফুট। আর ওজনে কুড়ি কিলো। ভাবতেই পারছো নিশ্চয়ই কি পেল্লায় পাখি ছিল ডোডো। এই পাখির প্রথম চাক্ষুশ বিবরন পাওয়া যায় ডাচদের বিবরন থেকে। ডোডোর কোন ফটো পাওয়া গেছে বলে শুনিনি। তবে সেই সময়কার অনেক শিল্পীই ছবি এঁকেছেন ডোডো নিয়ে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রোল্যান্ড স্যাভেরি। নীচের ছবিটি ১৬২৬ সালে আঁকা কালিপেনে। অবশ্য শিল্পী রোল্যান্ড নন। রোল্যান্ডের বেশীর ভাগ ছবিই তেলরঙে।

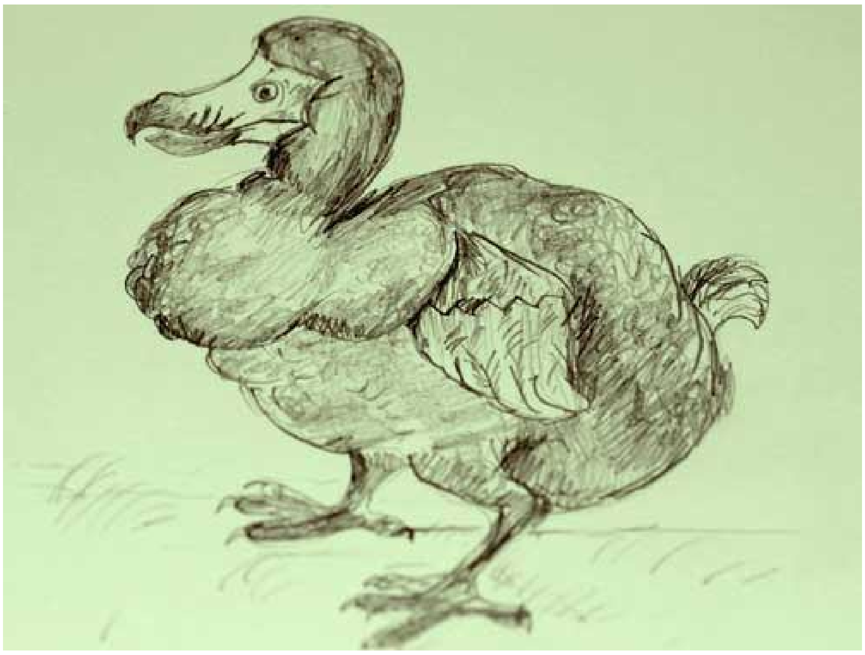

ডোডো পোর্ট্রেট। মূল শিল্পী - এড্রিয়েনে ভ্যান্ডার ভেন

আজকের দুনিয়ায় তাদের সবচেয়ে কাছের প্রজাতি হল নিকোবর পিজিয়ন (বিজ্ঞানসম্মত নামঃ কলোনিয়াস নিকোবারিকা)। অবাক হচ্ছ? বিজ্ঞানীরা বলেন ডোডোর উৎপত্তি হয়েছে আদপে পায়রা ও ঘুঘু প্রজাতি থেকে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় কলাম্বিডে। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যে পায়রার বা ঘুঘুর মত হালকা, উড়ুক্কু পাখি থেকে ডোডোর মত, বিরাট স্থূলকায়, উড়তে অক্ষম একটি প্রজাতির সৃষ্টি হল কি করে? প্রথম প্রথম কিন্তু ঐ প্রকান্ড ঠোঁট দেখে ডোডোদের শকুনের সমগোত্রীয় মনে করা হত। ১৮৪০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে একটি কঙ্কাল দেখতে দেখতে প্রানীবিজ্ঞানী রেনহার্ড পায়রার সাথে ডোডোর সাদৃশ্য খুঁজে পান। তাঁকে সমর্থন করেন এড্যুয়িন স্ট্রিকল্যান্ড। অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হল এই ঘটনায়। তারপরে অবশ্য একশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীরা এই মতামতকে সমর্থন করেছেন। শেষমেষ ডিএনএ পরীক্ষাতেও তা নির্ভুল প্রমানিত হয়।

ডিএনএ বিশ্লেষন করে না হয় দেখা গেল পায়রা থেকেই ডোডোর উৎপত্তি। কিন্তু তাইই বা হয় কি করে? এই নিয়ে একটি মতবাদ চালু আছে। তুমি বড় হয়ে যখন ল্যামার্ক আর চার্লস ডারউইনের মতবাদ পড়বে তখন হয়তো আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। অনুমান করা হয় আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে একদল পায়রা মরিশাসের দ্বীপগুলিতে হাজির হয়। একে তো পায়রাদের কোন জায়গায় একসাথে টানা বসবাস করার মতিগতি নেই। তারা বারে বারেই নতুন নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। হতে পারে হয়তো ঝড় উঠে তাদের এই দ্বীপে এনে হাজির করেছিল। আসল কথাটা হচ্ছে, যেভাবেই এসে পড়ুক না কেন, তারপর থেকে তারা সেখানেই থেকে যায়। মরিশাস ছিল পাখিদের কাছে স্বর্গ। ছোটখাটো যেসব স্তন্যপায়ী প্রানীদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা – যেমন ধেড়ে ইঁদুর, বেড়াল, কুকুল, বুনো শুয়োর ইত্যাদি এখানে একেবারেই ছিল না। সমুদ্রের প্রতিকূলতা তারা কোনদিনই পেরোতে পারেনি। ফলে পায়রাদের দল সেখানে বড় সুখেই থাকতে লাগল। সুখে থাকতে থাকতে যা হয়, তাই হল তাদের সাথে। আস্তে আস্তে আকাশে ওড়ার প্রয়োজন কমে আসতে থাকল। তারপর বিবর্তনের নিয়মেই ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েই গেল একেবারে। চেহারা ভারী হয়ে এল। সেই ভারী শরীরকে

বইবার জন্য পা শক্ত হল। ডানার শক্তি হারিয়ে যেতে শুরু করল। এই সুখের জীবনই শেষমেষ কাল হল তাদের কাছে।

পায়রা থেকে ডোডোর পথে। শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় নি

ডোডোদের সম্পর্কে কি কি জানা যায় না? অনেক কিছুই। যেমন ধর তাদের খাবারদাবার কি ছিল? যেহেতু তারা উড়তে পারত না, সেহেতু এরকম মনে করে নেওয়াটা নেহাত অনায্য হবে না যে ওরা খাবার সংগ্রহ করত মাটিতে পড়ে থাকে ফলমূল থেকেই। খুব সম্ভব সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তীরে উঠে আসা অনেক কিছুই খেয়ে ফেলত তারা। এমনটাও মনে করা হয় পায়রাদের মত তারাও মাঝে মাঝে ছোট খাট পাথর খেয়ে নিত, যা তাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করত।

ডোডো পাখির ঠোঁট। অনেক প্রশ্ন থেকেই গেছে এই নিয়ে

ডোডোদের সামাজিক জীবন নিয়েও সেভাবে প্রায় কিছুই জানতে পারা যায় না। ওরা কিভাবে দল বেঁধে থাকতো? কত বড় বা ছোট ছিল সেই পরিবার? কটা করে ডিম পাড়তো তারা একসাথে? কিভাবে বাচ্চারা বড় হত। এইসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজও জানা নেই। একে তো ডোডোর ওপরে প্রামান্য গ্রন্থের অভাব আছে, তারপরেও যেটুকু আছে তাতে আধুনিক বিজ্ঞানীরা খুবই সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন যে ঐসব লেখকেরা আদৌ কখনো ডোডো দেখেছেন কিনা। সাউথ আফ্রিকার ইস্ট লন্ডনে একটি ডোডো পাখির ডিম আজও সযত্নে রাখা আছে। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে ওটা আদপেই ডোডোর ডিম না উটপাখির ডিম – তাই নিয়ে। ডোডো পাখির ঠোঁট নিয়ে প্রশ্ন কম নেই। ঐ ঠোঁটের কারনেই পায়রাদের বংশ হিসেবে ডোডোকে মেনে নিতে অনেক সময় লেগেছে। কিন্তু ঐ বিশাল ঠোঁটের কাজটা ঠিক কি ছিল – আত্মরক্ষা? খাবার জোগাড় করা, মাটি খোঁড়া নাকি অন্য কোন জৈবিক প্রয়োজন? তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন ডোডোর হয়তো আরো উপপ্রজাতি ছিল। কিন্তু আজ তা প্রমান করবার বড় উপায় নেই।

যদিও প্রথমে আরবরা ও পরে পর্তুগীজরা মরিশাস দ্বীপপুঞ্জে পা রেখেছিল, তবু ডোডোর কথা প্রথম জানতে পারি আমরা ১৫৯৮ সালের ওলন্দাজ বিবরনী থেকেই। শুধু ওলন্দাজ নয়, তারপরে একে একে ফরাসী আর ইংরেজরাও এসেছে মরিশাসে। আর খুব সহজ শিকারের লোভেই হারিয়ে গেছে ডোডো। অনুমান করা হয় ১৬৪০ সালের মধ্যেই ডোডো হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। যদিও এর বেশ কিছু বছর পরে, ১৬৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক দাবী করেছেন তাঁরা ডোডো দেখেছেন বলে। তবে তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ থেকেই যায়। ভেবে দেখো মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে মানুষের আগ্রাসনে একটি প্রজাতি হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। নীচের ছবিটা দেখলে ডোডোদের করুন অবস্থার একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

মরিশাসে ডাচদের আগমন। মূল শিল্পী ডামরিকান

ডোডো না হয় একটা দুর্বল, ভীতু, অক্ষম প্রজাতির প্রানী ছিল। প্রকৃতির সাথে, প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই তাদের হার মানতে হয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভের কাছে। কিন্তু সিংহ? সে তো বনের রাজা। আমি কদিন আগে একটি সাফারি পার্কে গিয়ে জানতে পারি সিংহের একটি উপপ্রজাতি বার্বারি লায়ন চিরতরে হারিয়ে গেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। গুটিকয়েক সঙ্কর প্রজাতির সন্তান সন্ততি টিকে রয়েছে সাফারি পার্কের নিরাপদ আশ্রয়ে। তাহলে ভেবে দেখো

মানুষের কাছে কোন প্রানীই রেহাই পায়নি। অথচ প্রকৃতির প্রয়োজনে ওদের সবাইকেই বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। জীবনের বৈচিত্রকে যাতে বড় হয়ে বুঝতে পারো, সমস্ত প্রানীকেই ভালবাসতে পারো সেজন্য ছোট থেকেই প্রকৃতির নিয়মকে বুঝতে হবে। ডোডো পাখির মত আর কোন প্রজাতি যাতে ভবিষ্যতে হারিয়ে না যায় সে দায়িত্ত নিতে হবে আমাদেরই।

লেখা ও ছবিঃ
অভ্র পাল
কার্ডিফ, ওয়েল্‌স্‌, যুক্ত রাজ্য

জংলি ঘোড়া

আমরা জানি যে ভারতের গুজরাতে জংলি গাধা পাওয়া যায়, আফ্রিকায়ে জংলি কুকুর পাওয়া যায় আর বুনো মোষ, কিন্তু তুমি কি জংলি ঘোড়ার কথা শুনেছ?

কি বললে? শোননি?

ঠিক আছে, তাহলে আজ আমি তোমাকে জংলি ঘোড়ার কথা শোনাই, কেমন?

কয়েকদিন আগে আমরা "হুস্তাই নাশানাল পার্কে" বেড়াতে গেছিলাম। এই পার্ক মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতার থেকে ১০০ কিমি দুরে অবস্থিত।

আমরা দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া সেরে, একজন বন্ধুর গাড়ি চেপে ওই পার্কে বেড়াতে গেলাম। পার্কে ঢুকতে গেলে বিদেশীদের টিকিট কাটতে হয়। প্রতি টিকিট দশ ডলার।

সুতরাং আমরাও টিকিট কেটে, পার্কে ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল একজন মঙ্গোলিয়ান মেয়ে গাইড। সে আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চললো। কিছুদুর যাওয়ার পরে এক জায়গায়ে সে গাড়ি থামাতে বললো। আমরা ওখানে গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষায়ে বসে রইলাম। মেয়েটি আমাদের বললো যে জংলি ঘোড়া ওখান দিয়ে যাওয়া আসা করে। আমরা ছাড়াও ওখানে আরো অনেক লোক ছিল যারা বেড়াতে এসেছিলো।

ঘন্টা খানেক বসে থাকার পর, হঠাৎ দেখি সবাই একদিকে ইশারা করে কিছু বলছে। ভালো করে

দেখার পর বুঝতে পারলাম যে বেশ দূরে কিছু জংলি ঘোড়া দেখা যাচ্ছিলো। আমাদের গাইড মেয়েটির কাছে দুরবিন ছিলো। সেই দুরবিন দিয়ে ঘোড়াগুলিকে দেখলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া গুলো ঘাস খেতে খেতে বেশ কাছে চলে এলো। এবার তো দুরবিন ছাড়াও বেশ ভালো ভাবেই দেখা যাচ্ছিলো।

এই ঘোড়া দের "শেবাল্স্কি হর্স" বলা হয়। পোষা ঘোড়ার তুলনায় শরীরে একটু ছোট খাটো, ওদের ওজন প্রায় ৩০০ কিলোর কাছকাছি হয়। রং হালকা খয়েরি-সাদা মেশানো। ঘাড়ের কাছে ঘন খয়েরি রং। মঙ্গোলিয়ায় এদের 'জংলি ঘোড়া' বা 'টাখি' বলা হয়। এরা মধ্য এশিয়া আর গোবি মরুভূমির বাসিন্দা।

প্রায় চার দশক আগে এই ঘোড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে লুপ্ত হয়ে গেছিলো। ইউরোপের কিছু চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেতনা। প্রায় দু দশক আগে এই ঘোড়া গুলিকে ইউরোপ থেকে চীন ও মঙ্গোলিয়া আনা হয় এবং পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ছাড়ার চেষ্টা করা হয়। এখন সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ শেবাল্স্কি ঘোড়া আছে। মঙ্গোলিয়ার এই "হুস্তাই নাশানাল পার্ক" ছাড়াও এদের চিনের "কালামেলি পর্বতমালা", উক্রেনের "অস্কানিয়া নোভা" আর "চেরনোবিল" এলাকা এবং হাঙ্গারির "হর্তব্বগী পুস্যা" এলাকায়ে পাওয়া যায়।

এবার আবার আমি আমাদের কথায় ফিরে আসি। আমরা দেখলাম প্রায় দশটা ঘোড়ার একটা দল দূরের পাহাড় থেকে নেমে এসে আমাদের বেশ কাছ দিয়ে দৌড়ে বেড়িয়ে গেলো। আমরা যেখানে দাড়িয়ে ছিলাম, ওখান থেকে প্রায় দু-তিন শো মিটার দুরে একটি ছোট নালা ছিল। ঘোড়া গুলি দৌড়ে ওদিকে চলে গেলো আর নালার জল খেতে লাগলো, নালার আশেপাশের ঘাস চরতে লাগলো। আমরা খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার পর আবার ফিরে এলাম। একটি লুপ্তপ্রায় প্রাণীকে দেখতে পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছিলাম।

লেখা ও ছবিঃ
তৃপ্তি ভট্টাচার্যি
উলান বাতার, মঙ্গোলিয়া

এক্কা-দোক্কা: কমনওয়েলথ্ গেমস্

তোমার স্কুলে পূজোর ছুটি তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। আমার ছোটবেলার স্মৃতি থেকে বলতে পারি পুজোর ছুটির আনন্দের আমেজই আলাদা। একের পর এক দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, ভাইফোঁটা - সব কিছু মিলিয়ে কি ভাবে যে একটা মাস কেটে যায় বুঝতেই পারা যায়না। প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বন্ধুদের সাথে একসাথে বসে গল্প করা, বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের যাতায়াত, আর তার সাথে এই কয়েকটা দিন বাড়িতে বড়দের শাসনের মাত্রা একটু কমে যাওয়া সব নিয়ে যেন একটা স্বপ্নের সময়। এবারে পুজো শুরু হওয়ার আগে আগেই আবার পেয়ে গেলে একটা উপরি পাওনা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। কমনওয়েলথ্ গেমস্-এর কথাই বলছি। তার উপরে এই প্রথমবারের জন্য কমনওয়েলথ্ গেমস্ আয়োজিত হতে চলেছে আমাদের দেশে, দিল্লীতে অক্টোবর মাসের ৩ থেকে ১৪ তারিখ অবধি। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম ছাড়াও আরও অনেকগুলো ইন্ডোর আর আউটডোর মিলিয়ে আয়োজিত হবে বিভিন্ন খেলার আসরগুলো।

DELHI 2010
XIX COMMONWEALTH GAMES

অলিম্পিক আর এশিয়ান গেমস্-এর পর কমনওয়েলথ্ গেমস্-ই বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলো নিয়ে সবচেয়ে বড় খেলার আসর। অন্য বড় প্রতিযোগিতাগুলোর মত এটাও আয়োজিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ১৯৩০ সালে যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তখন এর নাম ছিল 'ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস্'। মাঝে তিনবার নাম পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সাল থেকে এর নাম হয় 'কমনওয়েলথ্ গেমস্'। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 'কমনওয়েলথ্ অব্ ন্যাশনস'-এর অন্তর্ভুক্ত ৫৪ টি দেশের প্রতিযোগীরা। ভাবছ তো যে এরকম একটা কঠিন নামের কি অর্থ আর কারাই বা অন্তর্ভুক্ত এই 'কমনওয়েলথ্ অব্ ন্যাশনস'-এর। একটু সহজ করে বলতে গেলে এই সংগঠনের দেশগুলো সকলেই নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কিছু কিছু মূল্যবোধের দিক দিয়ে নিজেদের মধ্যে একমত আর এগুলোর সঠিক রূপায়ণ আর উন্নয়নের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে থাকে। তাই খেলার সাথে সাথে অন্য দিক দিয়েও এই প্রতিযোগিতার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সাথে সাথে তাদের দেশের সাংবাদিক আর সাধারণ মানুষও হাজির হবে

নিজেদের দেশের দলকে উত্সাহ দেওয়ার জন্য। তারা ঘুরে বেড়াবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আর পরিচিত হবে আমাদের দেশের সাধারন মানুষ আর সংস্কৃতির সাথে। আর তাদের সাথে কথা বলে আমরাও জানতে পারব তাদের কথা, তাদের দেশের কথা। তাই তোমার যদি এরকম কারও সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়ে যায় তুমি কিন্তু তাদের যথাযোগ্য সন্মান দিয়ে বন্ধুর মত আপন করে নিয়ো - আর তাহলে দেখবে তারাও তোমাকে নিজেদের বন্ধু করে নেবে, আর তারপর নিজেদের দেশে গিয়ে তোমাকে নিয়ে কত গল্প করবে। আর তুমিও যদি পুজোর ছুটির সাথে সাথে নতুন দেশের নতুন বন্ধু পেয়ে যাও, তাহলে তো ছুটির আনন্দটা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, তাই না?

অলিম্পিক শুরু হওয়ার আগে অলিম্পিকের মশাল বিভিন্ন দেশে ঘোরার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। কমনওয়েলথ্ গেমস্-এও সেরকম কমনওয়েলথ্-এর প্রধান, যিনি এখন ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, তার ব্যাটন ঘুরতে থাকে সমস্ত অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে। এই ব্যাটনে খোদাই করা থাকে রাণীর বার্তা - সমস্ত অংশগ্রহণকারী দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে। লন্ডনে রাণীর প্রাসাদ বাকিঙ্গহাম প্যালেস থেকে গত বছরের ২৯শে অক্টোবর যাত্রা শুরু করে সব দেশ ঘুরে ৩রা অক্টোবর এই ব্যাটন পৌঁছবে উত্সবের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের সময়। সেখানে ইংল্যান্ডের রাণীর প্রতিনিধি সেই খোদাই করা বার্তা পড়ে শোনাবেন সকলের উদ্দেশ্যে - সকলকে এই উত্সবে যোগদান করে উপভোগ করার জন্য। এইবারের প্রতিযোগিতার জন্য এই ব্যাটনের নক্সা তৈরী করেছেন আহ্‌মেদাবাদের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ ডিজাইন-এর মাইকেল ফোরে। লম্বাটে, ত্রিকোণাকার, সর্পিল আকৃতির এই ব্যাটনটির মাথার দিকে রয়েছে একটি সোনার পাতায় খোদাই করা বার্তা। বিভিন্ন দেশে যখন ব্যাটন ঘুরেছে, তখন সেই দেশের পতাকার রঙ অনুযায়ী পরিবর্তন হবে ব্যাটনের রঙ।

এবারের গেমস্-এর যে ম্যাসকট তার ছবি নিশ্চয়ই তুমি এর মধ্যেই অনেক জায়গায় দেখে ফেলেছ। কমনওয়েলথ্ গেমস্-এর টি-শার্ট, শর্টস, জুতো-মোজা পরা এই হাশিখুশি বাঘটির নাম হল 'শেরা' - দেখলে মনে হবে যেন হাত নেড়ে সবাইকে ডাকছে উত্সবে সামিল হওয়ার জন্য। তার সাথে থাকছে গেমস্-এর থিম সং 'জিয়ো উঠো বাড়ো জিতো'। হিন্দী আর ইংরাজী মেশানো এই গানের কথাগুলি লিখেছেন মেহবুব আর গানটির সুর দিয়েছেন আর গেয়েছেন এ. আর. রহমান।

১২ দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতায় থাকবে দৌড়, লং-জাম্প, সাঁতার, ডাইভিং, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশ, টেবল টেনিস, কুস্তি, বক্সিং, হকি, শুটিং, জিমন্যাস্টিক-এর মত অনেক ধরণের খেলা। তুমি নিজের ইচ্ছেমত নজর রাখতে পারবে নিজের পছন্দের খেলাগুলোর দিকে। ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে যে শেষ কমনওয়েলথ্ গেমস্ আয়োজিত হয়েছিল তাতে ৫০ টি পদক জিতে ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ - অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড আর কানাডা-র পরে। এর মধ্যে ছিল ২২ টি সোনা, ১৭ টি রুপো আর ১১ টি ব্রোঞ্জ পদক। এবারেও বেশীরভাগ খেলাতেই অংশ নেবে আমাদের দেশের প্রতিযোগীরা। এর মধ্যে থাকবে আমাদের হকির দল, শুটিং-এর বিভাগে থাকবেন সমরেশ জং, অঞ্জলি ভগবত, তেজশ্বিনী সাওয়ান্ত, টেনিসে থাকবেন লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, রোহন বোপান্নাদের মত অভিজ্ঞদের সাথে সানিয়া মির্জা, সোমদেব দেববর্মনের মত তরুণেরা, ব্যাডমিন্টনে থাকবেন সাইনা নেহওয়াল, চেতন আনন্দ, স্কোয়াশে জোশনা চিনাপ্পা, তিরন্দাজীতে তরুণদীপ রাইয়ের মত আরও অনেকে। এদের মধ্যে সমরেশ জং ২০০৬-এর কমনওয়েলথ্ গেমস্-এ একাই জিতেছিলেন সাতটি পদক।

ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহওয়ালের নাম এতদিনে অনেক জায়গাতেই হয়তো শুনে থাকবে। হরিয়ানার হিসারে জন্ম হওয়া আর হায়দ্রাবাদে বড় হওয়া ২০ বছরের এই মেয়েটি এর মধ্যেই বিশ্ব-ক্রমপর্যায়ে তৃতীয় স্থানে চলে এসেছেন আর জিতে ফেলেছেন অনেক বড় মাপের প্রতিযোগিতা।

সদ্য শেষ হওয়া ইউ. এস. ওপেন টেনিসে ছেলেদের ডাবলস-এর রানার-আপ ট্রফি জিতেছেন রোহন বোপান্না। তাই আমরা আশা করতেই পারি যে এরা সকলে ভাল খেলে আমাদের দেশকে অনেক পদক এনে দেবেন।

গত ৩রা তারিখের সন্ধ্যাবেলা দিল্লীতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে গেম্‌স্‌। তোমার

সাথে সাথে আমিও মনেপ্রাণে চাইছি যেন সবকিছু ভালভাবে আয়োজিত হয়ে আমাদের দেশের সন্মান রক্ষা হয় আর আশা করছি যেন এবারে আমরা আগেরবারের থেকে আরও বেশী পদক জিতে আরও ভাল ফল করতে পারি। তাহলে যে পুজোর ছুটির আনন্দ সব মিলিয়ে একদম পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে!

লেখাঃ
পাভেল ঘোষ,
টেম্পি, আরিজোনা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
বিভিন্ন ওয়েবসাইট

আঁকিবুকি

অমৃতা তেওয়ারি
দ্বিতীয় শ্রেণী, মহাদেবী বিড়লা গার্লস' হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, কলকাতা

চিন্ময়ী ভট্টাচার্য্যি
সিনিয়র কে জি, অর্কলন কিন্ডারগার্টেন, উলান বাতার, মঙ্গোলিয়া

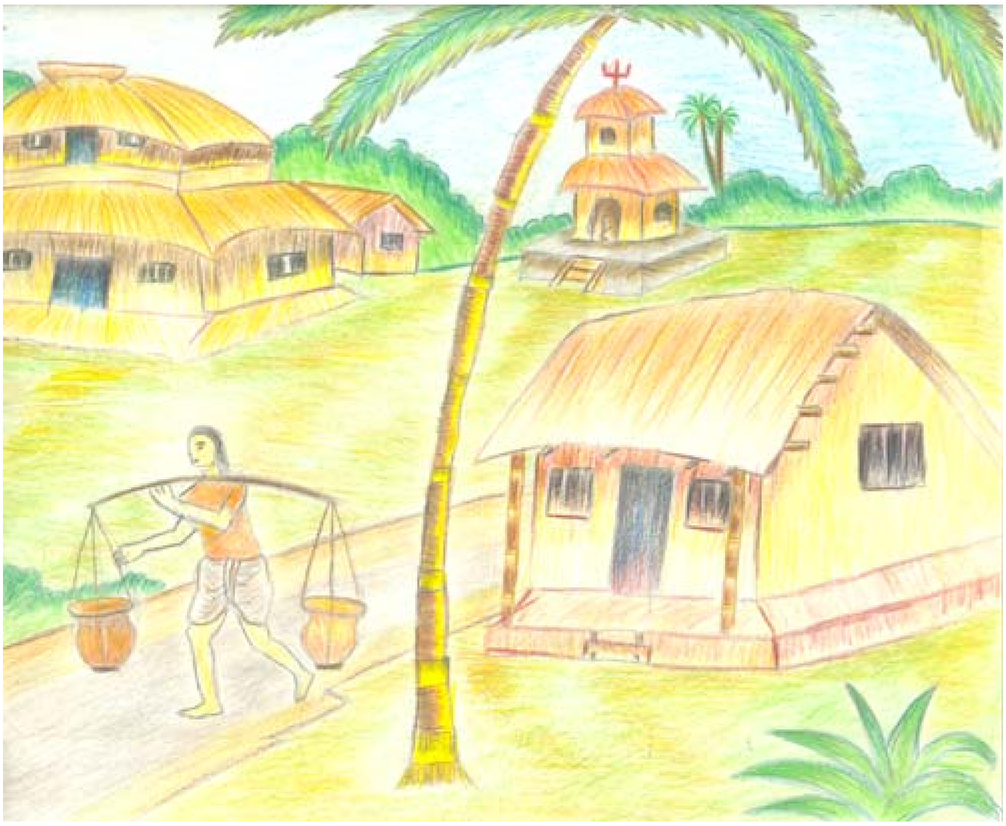

দেবারুণ দেব
তৃতীয় শ্রেনী,এপিজে স্কুল, সল্ট লেক, কলকাতা

দিশারী বোস
ষষ্ঠ শ্রেণী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

ইন্দ্রানী জানা
পঞ্চম শ্রেণী,দ্য বি জি ই এস স্কুল, কলকাতা

ইন্দ্রনীল জানা
সপ্তম শ্রেণী,দ্য বি জি ই এস স্কুল, কলকাতা

মধুরিমা গোস্বামী
ষষ্ঠ শ্রেণী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

নীলাগ্নি দাস
প্রথম শ্রেনী,মারিয়া'স পাব্লিক স্কুল, গুয়াহাটি

ঋত চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণী,ডন বস্কো স্কুল, লিলুয়া

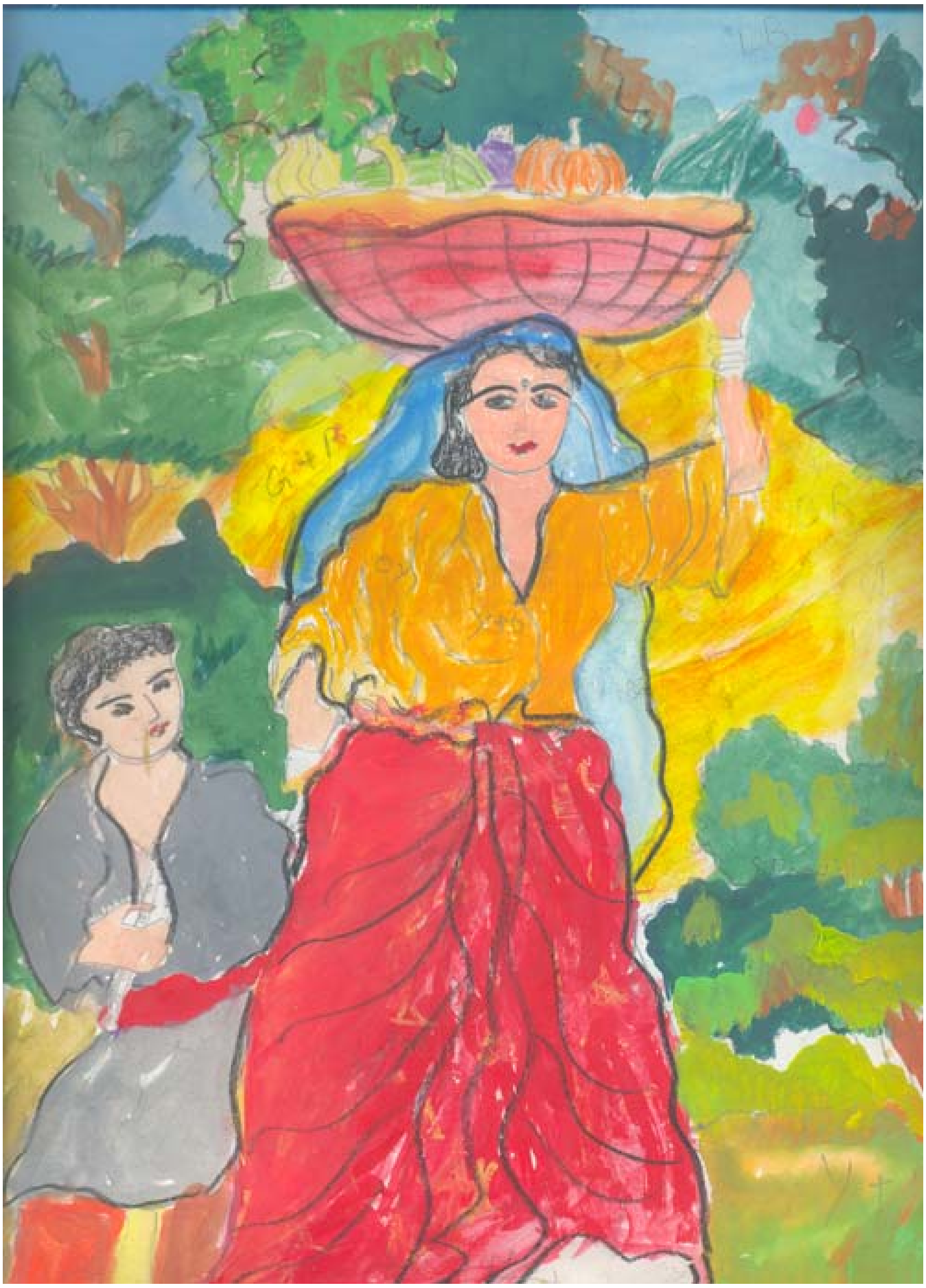

শৌর্য মুখার্জী
ষষ্ঠ শ্রেনী (আফটারনুন), সাউথ পয়েন্ট স্কুল, কলকাতা

শৌভিক সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় শ্রেণী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

শ্রেয়া বোস
প্রথম শ্রেনী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

শ্রীজা বোস
প্রথম শ্রেনী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

সৃষ্টি মৃধা
ষষ্ঠ শ্রেনী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

শুভম গোস্বামী
দ্বিতীয় শ্রেণী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা

সুদীপা কুজুর
তৃতীয় শ্রেনী,বি ডি মেমোরিয়াল স্কুল, কলকাতা